অধ্যায় 8 মানব শারীরতত্ত্ব: রক্ত ও রক্ত সঞ্চালন
(HUMAN PHYSIOLOGY: BLOOD AND CIRCULATION)

আমাদের দেহের ভেতর একটি বিশেষ তন্ত্র খাদ্যসার, শ্বসন গ্যাস ও রেচন বর্জ্য পরিবহন এবং দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, বিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ, বিভিন্ন অঙ্গ ও তন্ত্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও রোগজীবাণু প্রতিরোধ কাজে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত। বৃটিশ বিজ্ঞানী উইলিয়াম হার্ভে (William Harvey) 1628 সালে সর্বপ্রথম মানবদেহে এ ধরনের একটি তন্ত্রের বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। এর নাম রক্ত সংবহনতন্ত্র। এ অধ্যায়ে মানব রক্ত সংবহনতন্ত্র এবং এর কিছু জটিলতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রধান শব্দাবলি (Key words)

- ❑ রক্ত
- ❑ প্লাজমা
- ❑ লসিকা
- ❑ রক্ততঞ্চন
- ❑ হৃৎচক্র
- ❑ কার্ডিয়াক পেশি
- ❑ ব্যারোরিসেপ্টর
- ❑ সিস্টেমিক সংবহন
- ❑ করোনারি বাইপাস
- ❑ অ্যানজাইনা
- ❑ হার্ট অ্যটাক
- ❑ হার্ট ফেইলিউর
- ❑ পেস মেকার
- ❑ অ্যানজিওপ্লাস্টি

পিরিয়ড সংখ্যা ১৪। এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যা পারবে

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১। রক্ত কণিকা ও লসিকা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে ।	● রক্ত ও লসিকা
২। রক্ত জমাট বাঁধার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● রক্ত জমাট বাধা
৩। ব্যবহারিক: রক্তের কণিকাসমূহ শনাক্ত ও চিত্র অংকন করতে পারবে।	● ব্যবহারিক ○ রক্ত কণিকাসমূহের স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ
৪। হৃৎপিণ্ডের গঠন বর্ণনা করতে পারবে।	● হৃৎপিণ্ডের গঠন
৫। হার্টবিটের দশাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● হার্টবিট, বিভিন্ন দশা ও এর নিয়ন্ত্রণে SA নোড, AV নোড এবং পারকিনজি আঁশের ভূমিকা
৬। হার্টবিট নিয়ন্ত্রণে SA নোড, AV নোড এবং পারকিনজি আঁশের (Purkinji fibers) ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ব্যারোরিসেপ্টর এবং আয়তন রিসেপ্টরের ভূমিকা
৭। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ব্যারোরিসেপ্টর (baroreceptors) এবং আয়তন রিসেপ্টরের (volume receptors) ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● মানবদেহে রক্তসংবহন তন্ত্র ○ সিস্টেমিক সংবহন ○ পালমোনারি সংবহন
৮। মানবদেহে রক্ত সংবহন পদ্ধতির তুলনা করতে পারবে।	● হৃৎরোগের বিভিন্ন অবস্থায় করণীয় ○ বুকে ব্যথা ○ হার্ট এটাক ○ হার্ট ফেইলিউর
৯। হৃৎরোগের বিভিন্ন অবস্থা ও করণীয় ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● হৃৎরোগের চিকিৎসায় ধারণা ○ পেস মেকার কার্যক্রম ○ ওপেন হার্ট সার্জারি ○ করোনারি বাইপাস ○ এনজিওপ্লাস্টি
১০। হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক রক্ত সঞ্চালনে পেস মেকারের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবে।	
১১। ওপেন হার্ট সার্জারি, করোনারি বাইপাস এবং এনজিওপ্লাস্টের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	

মানবদেহে সংবহনতন্ত্র কতগুলো অঙ্গ ও নালিকার সমন্বয়ে গঠিত একটি বিশাল তন্ত্র যা রক্ত, পুষ্টি পদার্থ, হরমোন, রেচন বর্জ্য, শ্বসন গ্যাস ইত্যাদির প্রবাহ অক্ষুন্ন রাখে এবং কোষ হতে কোষে বিভিন্ন বস্তু আদান-প্রদান করে। এ তন্ত্র ছাড়া দেহ বিভিন্ন রোগের বিরুদ্ধে যেমন কোন প্রতিরোধ গড়তে পারে না তেমনি দেহের অভ্যন্তরীন পরিবেশের তাপ ও pH নিয়ন্ত্রণসহ অন্যান্য সাম্যবস্থা (homeostasis) বজায় রাখতে পারে না। মানবদেহের সংবহনতন্ত্র প্রধান দুটি উপাদান নিয়ে গঠিত: রক্তসংবহনতন্ত্র (cardiovascular system) যা রক্ত পরিবহনের সাথে জড়িত এবং লসিকা তন্ত্র (lymphatic system) যা লসিকা পরিবহনের সাথে জড়িত। মানবদেহের রক্ত সংবহনতন্ত্র বা কার্ডিওভাস্কুলার তন্ত্র প্রধানত রক্ত, হৃৎপিণ্ড ও রক্তবাহিকা নিয়ে গঠিত।

CamScanner

রক্ত সংবহনতন্ত্রের মাইলফলক (Milestones of Cardiovascular system)

১৬শ খ্রিস্টপূর্ব: প্রাচীন মিশরীয় চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ ইবার্স পেপাইরাস (Ebers Papyrus)-এ ধমনি ও হৃৎপিণ্ডের সংযোগ সম্পর্কিত বিবরণ উল্লেখ আছে।

৬ষ্ঠ খ্রিস্টপূর্ব: ভারতীয় আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক **শুশ্রুতা** (Sushruta) মানবদেহে জীবজ তরলের (vital fluids) প্রবাহ বর্ণনা করেন।

২য় খ্রিস্টাব্দ: গ্রিক চিকিৎসক **গ্যালেন** (Galen) রক্তনালি দ্বারা রক্ত প্রবাহ, শিরা ও ধামনিক রক্ত শনাক্তকরণ ও এদের ভিন্ন ধরনের কাজের বিবরণ দেন।

১৬২৮ খ্রিস্টাব্দ: ইংরেজ চিকিৎসক **উইলিয়াম হার্ভে** (William Harvey) প্রথম মানবদেহের রক্ত সংবহনের বর্ণনা করেন।

১৭০৬ খ্রিস্টাব্দ: ফরাসি অ্যানাটমির অধ্যাপক **রেমন্ড ডি ভিউসেন্স** (Raymond de Vieussens) প্রথম হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠ ও নালিকা সম্পর্কে বিবরণ দেন।

১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দ: ব্রিটিশ বিজ্ঞানী **স্টিফেন হেলস** (Stephen Hales) প্রথম রক্তচাপ পরিমাপ করেন।

১৮১৬ খ্রিস্টাব্দ: ফরাসি চিকিৎসক **রেন লিনেক** (Rene Laennec) স্টেথোস্কোপ আবিষ্কার করেন।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ: আমেরিকান শল্যচিকিৎসক **জন লুইস** (John Lewis) প্রথম সফলভাবে ওপেন হার্ট সার্জারি সম্পন্ন করেন।

১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ: দক্ষিণ আফ্রিকার শল্যচিকিৎসক **ক্রিস্টিয়ান বার্নাড** (Christiaan Barnard) সফলভাবে একজনের দেহ হতে অন্যজনের দেহে হৃৎপিণ্ড প্রতিস্থাপন করেন।

১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ: আমেরিকান শল্যচিকিৎসক **রবার্ট জারভিক** (Robert Jarvik) প্রথম কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড তৈরি করেন এবং শল্যচিকিৎসক **উইলেম ডি ভ্রিস** (Willem DeVries) তা মানবদেহে সংস্থাপন করেন।

৪.১ রক্ত (Blood)

রক্ত বিশেষ ধরনের প্রবহমান তরল যোজক কলা যা অধিক আয়নিক ঘনত্বের দ্রবণ প্লাজমা ও রক্তকণিকা নিয়ে গঠিত এবং যা হৃৎপিণ্ড ও বদ্ধ রক্তনালির মাধ্যমে সমগ্র দেহে পরিবাহিত হয়ে পুষ্টি পদার্থ, অ্যান্টিবডি, আয়ন, শ্বসন গ্যাস (O_2 ও CO_2) ও বর্জ্য পদার্থ বহন করে। রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণের অস্বচ্ছ, ঈষৎ ক্ষারীয়, ঘন, পানি অপেক্ষা ভারী, লবণাক্ত ও আঠালো চট্‌চটে তরল পদার্থ। এর pH 7.35-7.45, ঘনত্ব 1.06 g/ml, আপেক্ষিক গুরুত্ব 1.05-1.06, তাপমাত্রা 36-37°C। একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষের দেহে 5-6 লিটার এবং মহিলার দেহে 4.5-5.5 লিটার রক্ত থাকে যা মোট দৈহিক ওজনের 7-8%। একটি সদ্যোপ্রসূত শিশুর দেহে 90 মিলিলিটার/কেজি মাত্রায় রক্ত থাকে। রক্ত নিউটনের সান্দ্রতা সূত্র (Newton's Law of Viscosity) মেনে চলে না।

রক্তের কার্যাবলি

১। **শ্বসন গ্যাস পরিবহন:** রক্তের প্লাজমা এবং লোহিত কণিকা (RBC) দ্বারা ফুসফুস হতে কোষ-কলায় O_2 এবং কোষ-কলা হতে ফুসফুসে CO_2 পরিবাহিত হয়।

২। **খাদ্যবস্তু পরিবহন:** বিভিন্ন খাদ্যসার যেমন- গ্লুকোজ, অ্যামিনো অ্যাসিড, ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল এবং ভিটামিন, খনিজলবণ ও পানি অন্ত্র থেকে রক্ত দ্বারা পরিবাহিত হয়ে দেহের বিভিন্ন অংশে পৌছায়।

৩। **বিবিধ বস্তু পরিবহন:** রেচন বর্জ্য (ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, বিলিরুবিন ইত্যাদি), হরমোন, অ্যান্টিবডি, খনিজলবণ, এনজাইম, প্লাজমাপ্রোটিন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যাদি রক্ত দ্বারা পরিবাহিত হয়।

৪। **তাপসাম্যতা রক্ষা:** যকৃত ও পেশিকোষে খাদ্যসার জারণের মাধ্যমে দেহে প্রচুর পরিমাণ তাপ সৃষ্টি হয়। এ তাপ রক্ত দ্বারা সমগ্র দেহে পরিবাহিত হয়ে দেহের তাপ সাম্যতা রক্ষা করে।

৫। **রোগ জীবাণু প্রতিরোধ:** রক্তের শ্বেত কণিকা (WBC) বিভিন্ন রোগের জীবাণু ভক্ষণ করে এবং জীবাণুর বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি ও এনজাইম সৃষ্টি করে দেহের রোগ প্রতিরোধ করে।

CamScanner

৬। **রক্তক্ষরণ প্রতিরোধ:** রক্তের অণুচক্রিকা ও প্লাজমাপ্রোটিন সম্মিলিতভাবে ক্ষতস্থানে রক্ততঞ্চন ঘটিয়ে দেহের রক্তক্ষরণ প্রতিরোধ করে।

৭। **পানিসাম্যতা রক্ষা:** রক্ত কোষ ও কলায় পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি সরবরাহ করে দেহকে শুষ্কতা হতে রক্ষা করে। আবার দেহে পানির পরিমাণ বেড়ে গেলে রক্ত অতিরিক্ত পানি বৃক্কের মাধ্যমে দেহ হতে বহিষ্কার করে।

৮। **হোমিওস্ট্যাসিস রক্ষা:** রক্ত দেহের অভ্যন্তরীন পরিবেশের ভারসাম্য (হোমিওস্ট্যাসিস) বিশেষ করে আয়ন সাম্যতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৯। **pH নিয়ন্ত্রণ:** রক্ত অম্ল ও ক্ষারের রাসায়নিক বাফার সৃষ্টি করে দেহতরলের pH নিয়ন্ত্রণ করে।

১০। **রোগ নির্ণয়:** রোগ, সংক্রমণ বা অন্য কোনো কারণে দেহের কোনোরকম পরিবর্তন ঘটলে রক্তের উপাদানের পরিবর্তন দেখা যায়। একারণে রক্তের রাসায়নিক উপাদান বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন রোগ নির্ণয় (clinical diagnosis) করা হয়।

রক্তের উপাদান

মানুষের রক্ত নিম্নলিখিত উপাদানসমূহ নিয়ে গঠিত-

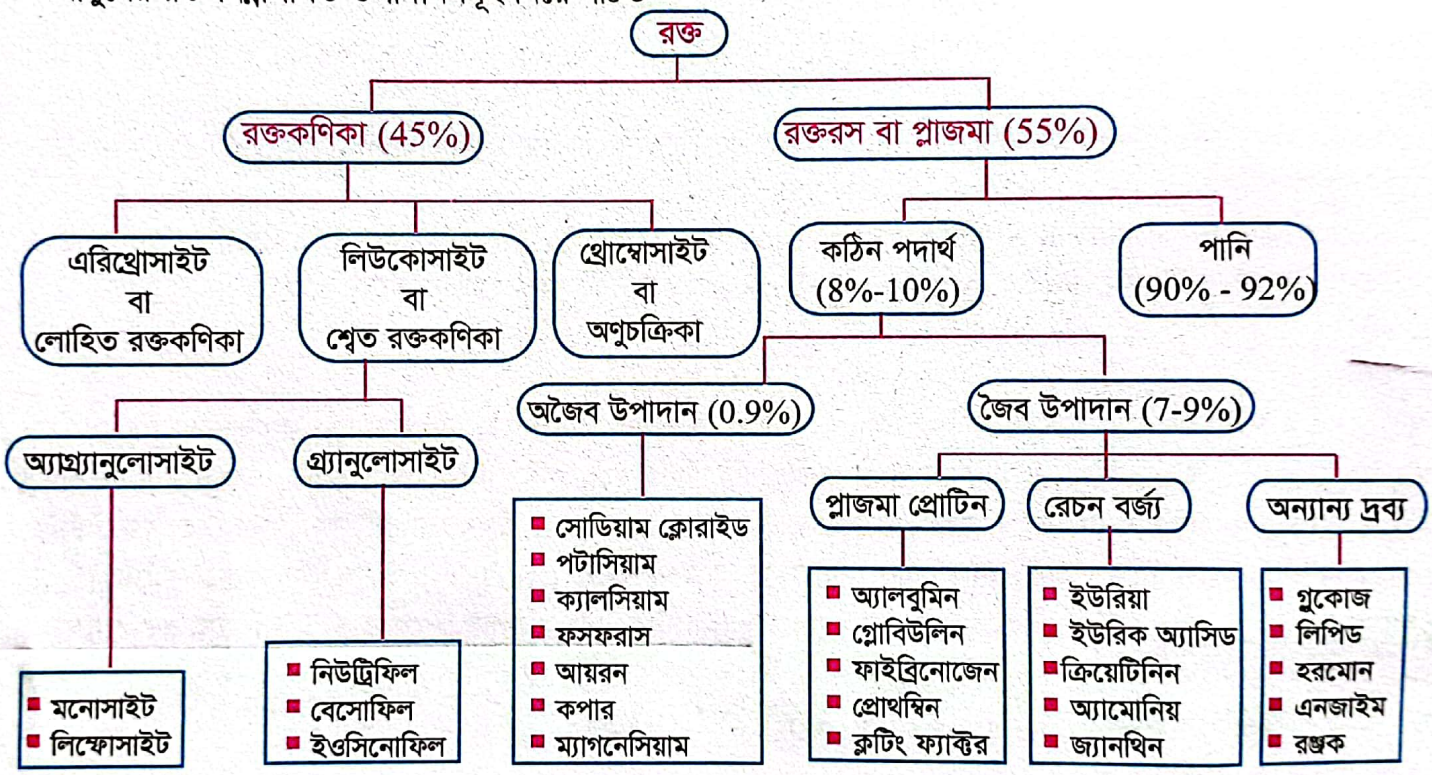

রক্তের গঠন, রক্ত সৃষ্টি প্রক্রিয়া, রক্ত সংক্রান্ত রোগ ইত্যাদি নিয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানের শাখাকে **হেমাটোলজি** (Hematology) বলে। গ্রিক শব্দ *haima* =রক্ত হতে এ শব্দটির উৎপত্তি। **স্ট্যান্ডার্ড উইনট্রব পদ্ধতিতে** (Standard Wintrobe Method) রক্তের বিভিন্ন উপাদানের অনুপাত বের করা হয়। মানুষের একফোটা রক্তের প্রায় অর্ধেক প্লাজমা, 5 মিলিয়ন লোহিত রক্তকণিকা, 10 হাজার শ্বেত রক্তকণিকা এবং 250 হাজার অণুচক্রিকা।

১। প্লাজমা বা রক্তরস (Plasma)

রক্তের ঈষৎ ক্ষারধর্মী হালকা হলুদ বর্ণের অকোষী তরল অংশকে রক্তরস বা প্লাজমা বলে। এটি একটি বহিঃকোষীয় তরল যেখানে বিপুল পরিমাণ আয়ন, জৈব ও অজৈব বস্তুর সমাহার থাকে। রক্তরসের ঘনত্ব 1.025 g/ml এবং pH =7.4। রক্তের মোট আয়তনের 55% হলো রক্তরস। একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ মানুষের দেহে প্রায় 3 লিটার রক্তরস থাকে যা দেহের ওজনের 5%। রক্তরসের অধিকাংশই পানি (90%-92%)। এতে কঠিন পদার্থ (8%-10%) হিসেবে বিভিন্ন অজৈব ও জৈব পদার্থ থাকে।

CamScanner

❑**অজৈব পদার্থ** (0.9%): বিভিন্ন লবণের আয়ন (Na^+, K^+, Ca^{2+}, Mg^{2+}, P^{3+}, Fe^{2+}, PO_4^{3-}, SO_4^{2-}, Mn^{2+}, Cl^-, Zn^{2+}), কপার, আয়োডিন ইত্যাদি।

❑**জৈব পদার্থ** (7-9%): রক্তরসে বিদ্যমান জৈব পদার্থগুলো হলো:

(ক) দ্রবীভূত প্রোটিন: মানুষের রক্তরসে প্রায় 7 g/dL ঘনত্বে প্রোটিন অণু দ্রবীভূত থাকে। এদের প্লাজমা প্রোটিন বলে। রক্তরসে দ্রবীভূত উল্লেখযোগ্য প্রোটিন হলো-প্রোথম্বিন, ফাইব্রিনোজেন, অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন, ইমিউনোগ্লোবিন, সাইটোক্রোম সি ইত্যাদি।

(খ) নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য: ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, ক্রিয়েটিনিন, জ্যানথিন, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি।

(গ) অন্যান্য যৌগ: হরমোন, ভিটামিন, অ্যান্টিবডি, এনজাইম, বিলিরুবিন, বিলিভার্ডিন, ক্রিয়েটিন, ফ্যাট, কোলেস্টেরল, গ্লুকোজ ইত্যাদি।

রক্তরসে কার্বন ডাই-অক্সাইড, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি গ্যাস দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। বিভিন্ন কলায় রক্তরসের উপাদানের কিছুটা ভিন্নতা দেখা যায় যা যকৃত ও বৃক্ক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। **সিমুলেটেড বডি ফ্লুইড** (Simulated body fluid -SBF) একটি বিশেষ ধরনের দ্রবণ যার আয়ণিক উপাদান অনেকটা রক্তরসের মতো।

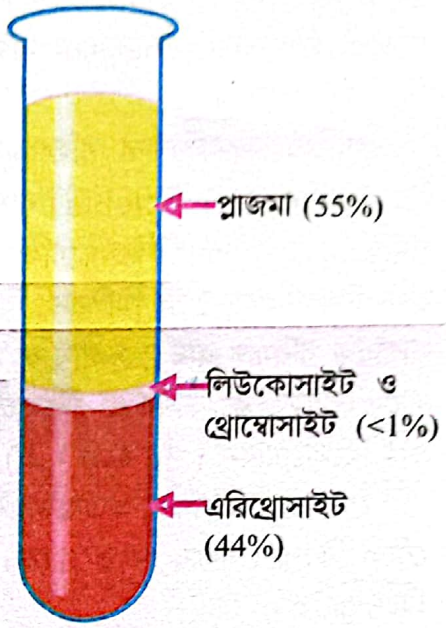

চিত্র ৪.১: রক্তের বিভিন্ন উপাদান (উইনট্রব পদ্ধতিতে নির্ণিত)

রক্তরস বা প্লাজমার কাজ

১। প্লাজমা রক্ত কণিকাসমূহ ধারণ করে এবং রক্তের তারল্য রক্ষা করে।

২। এটি অন্ত্র থেকে খাদ্যসার, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ, পানি ইত্যাদি পরিবহন করে দেহের বিভিন্ন অংশে পৌঁছে দেয়। এছাড়া এটি শ্বসন গ্যাস, রেচন বর্জ্য, হরমোন, এনজাইম, অ্যান্টিবডি ইত্যাদি পরিবহন করে।

৩। এটি রক্তে অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য রক্ষা, রক্ততঞ্চন এবং দেহের তাপ সাম্যতা রক্ষায় ভূমিকা রাখে।

৪। এটি দেহের প্রোটিন আধার হিসেবে কাজ করে।

৫। এটি আন্তঃকোষীয় আয়ণিক সাম্যতা রক্ষার মাধ্যমে দেহকে বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণ ও রোগের হাত হতে সুরক্ষা করে।

২। রক্তকণিকা (Blood corpuscles)

রক্তে ভাসমান বিভিন্ন কোষকে রক্তকণিকা বলা হয়। এগুলো **হেমাটোপয়সিস** (hematopoiesis) প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়। **এগুলো অন্যান্য কোষের মতো স্ববিভাজিত হয়ে সৃষ্টি হয় না বলে এদের কোষ না বলে কণিকা বলা হয়।** রক্তের 45% হলো রক্তকণিকা যা রক্তরসের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে। রক্তকণিকা তিন ধরনের, যথা-

(ক) এরিথ্রোসাইট বা লোহিত রক্তকণিকা
(খ) লিউকোসাইট বা শ্বেত রক্তকণিকা
(গ) থ্রোম্বোসাইট বা অণুচক্রিকা

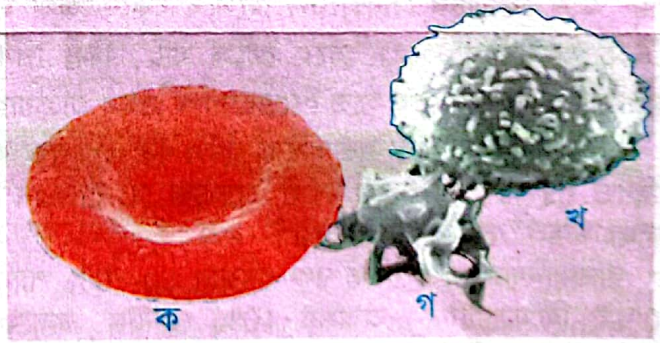

চিত্র ৪.২ ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্রে দৃশ্যমান মানুষের রক্তকণিকা: (ক) লোহিত রক্তকণিকা (খ) শ্বেত রক্তকণিকা (গ) অণুচক্রিকা

(ক) এরিথ্রোসাইট বা লোহিত রক্তকণিকা

(Erythrocytes or Red Blood Corpuscles or RBC; Gr. *erythros* = red, *kytos* = cell)

রক্তরসে বিদ্যমান লাল বর্ণের, বৃত্তাকার, দ্বি-অবতল, নিউক্লিয়াসবিহীন, চাকতির মতো গঠন বিশিষ্ট রক্তকণিকাকে এরিথ্রোসাইট বা লোহিত রক্তকণিকা বা হিমাটিড বলে। এগুলো গোলাকার, দ্বি-অবতল চাকতি আকৃতির। প্রতিটি

CamScanner

লোহিত রক্তকণিকার ব্যাস 7-8 মাইক্রোমিটার এবং পুরুত্ব 2.2 মাইক্রোমিটার। এদের কেন্দ্রভাগ পাতলা এবং প্রান্তভাগ পুরু। রক্ত রঞ্জক হিমোগ্লোবিনকে অধিকতর জায়গা দেয়ার কারণে এদের নিউক্লিয়াস, RNA, গলগি বস্তু, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিক্যুলাম এবং মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে না। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে কেবল উটের লোহিত রক্তকণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে।

লোহিত রক্তকণিকার বাইরের দিকে প্লাজমা আবরণী এবং অভ্যন্তরে প্রোটিন ও লৌহ নির্মিত লাল বর্ণের হিমোগ্লোবিন (Hemoglobin) নামক রঞ্জক পদার্থ থাকে। হিমোগ্লোবিন লৌহ (*heme=iron*) ও প্রোটিন (*globin*) পদার্থ দিয়ে গঠিত। হিমোগ্লোবিন থাকার কারণে লোহিত রক্তকণিকা লাল বর্ণের দেখায়। মানুষের প্রতিটি লোহিত রক্তকণিকায় প্রায় 270 মিলিয়ন হিমোগ্লোবিন অণু থাকে। মানবদেহের সকল লোহিত রক্তকণিকায় বিদ্যমান লৌহের সামগ্রিক পরিমাণ প্রায় 2.5 গ্রাম যা মানবদেহের মোট লৌহের প্রায় 65%। শ্বসনের সময় ফুসফুসে আগত অক্সিজেনের সাথে লোহিত রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিন যুক্ত হয়ে অক্সিহিমোগ্লোবিন (oxyhemoglobin) যৌগ গঠন করে। প্রতি গ্রাম হিমোগ্লোবিন 1.36 হতে 1.40 মিলিলিটার অক্সিজেন যুক্ত করার ক্ষমতা রাখে।

লোহিত রক্তকণিকা অত্যন্ত নমণীয় ও স্থিতিস্থাপক প্রকৃতির। রক্তবাহিকার অভ্যন্তরে প্রবাহের সময় এরা খুব সহজেই বেঁকে কিংবা পেঁচিয়ে যেতে পারে। এদের প্লাজমা আবরণী ক্লোরাইড ও বাইকার্বনেট আয়নের দ্রুত বিনিময়ের জন্য বিশেষায়িত।

প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মানুষের প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে প্রায় 5.4 মিলিয়ন এবং স্ত্রীলোকের রক্তে প্রায় 4.8 মিলিয়ন লোহিত রক্তকণিকা থাকে। শিশুদের রক্তে লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। রক্তে লোহিত রক্তকণিকার আয়তন পরিমাপের শতকরা হিসাবকে হেমাটোক্রিট (hematocrit; Ht or HCT) বলে। আয়তনের দিক দিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় পুরুষের রক্তে লোহিত রক্তকণিকা 45% এবং মহিলাদের 40%।

মানব ভ্রূণের প্রাথমিক পর্যায়ে কুসুম থলিতে, শেষ পর্যায়ে যকৃতে এবং জন্মের পর থেকে অস্থিমজ্জার স্টেম কোষ (stem cell) হতে এরিথ্রোপোয়েসিস (erythropoiesis; Gr. *erythro*=red + *poiesis*=to make) পদ্ধতিতে লোহিত রক্তকণিকা সৃষ্টি হয়। লোহিত রক্তকণিকার আয়ুষ্কাল 120 দিন। মানবদেহে প্রতি সেকেন্ডে 20 লক্ষের অধিক লোহিত রক্তকণিকার মৃত্যু হয় এবং সমপরিমাণ সৃষ্টি হয়। মৃত্যুর পর লোহিত কণিকাগুলো যকৃত ও প্লীহায় বিশ্লেষিত হয়। এদের লৌহ অংশ ফেরিটিন (ferritin) হিসেবে যকৃতে জমা হয়ে (এগুলো নতুন RBC সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করে) দেহে থেকে যায়, কিন্তু পিগমেন্টগুলো বিলিরুবিন বা বিলিভার্ডিন হিসেবে দেহ হতে পিত্তের সাথে রেচন প্রক্রিয়ায় নিষ্কাশিত হয়।

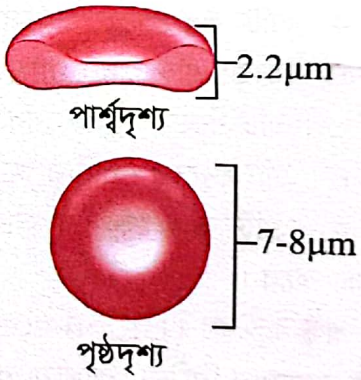

চিত্র ৪.৩ লোহিত রক্তকণিকা

মানবদেহে লোহিত রক্তকণিকা প্রতি 60 সেকেন্ড বা 1 মিনিটে একবার সমগ্র দেহ পরিভ্রমণ করে। একজন পরিণত সুস্থ মানুষের দেহে সর্বদা প্রায় 20-30 ট্রিলিয়ন লোহিত রক্তকণিকা বিদ্যমান থাকে যা সংখ্যার দিক থেকে দেহের সকল কোষের প্রায় 70%।

রাসায়নিকভাবে লোহিত রক্তকণিকার 60-70% পানি এবং 30-40% কঠিন পদার্থ। কঠিন পদার্থের মধ্যে প্রায় 90%ই হিমোগ্লোবিন। অবশিষ্ট 10% প্রোটিন, ফসফোলিপিড, কোলেস্টেরল, অজৈব লবণ, অজৈব ফসফেট, পটাসিয়াম ইত্যাদি নিয়ে গঠিত।

লোহিত রক্তকণিকার কাজ

১। লোহিত রক্তকণিকা অক্সিহিমোগ্লোবিন হিসেবে ফুসফুস থেকে দেহকোষে অধিকাংশ O_2 পরিবহন করে।

২। এরা পটাসিয়াম বাইকার্বনেট হিসেবে কোষ-কলা থেকে ফুসফুসে সামান্য পরিমাণে CO_2 পরিবহন করে।

৩। এরা রক্তের সান্দ্রতা (viscocity) রক্ষা করে।

৪। এদের হিমোগ্লোবিন ও অন্যান্য অন্তঃকোষীয় বস্তু বাফাররূপে (as buffer) রক্তে অম্ল-ক্ষারের সাম্যতা রক্ষা করে।

CamScanner

৫। লোহিত রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিন যকৃতে ভেঙ্গে পিত্তরঞ্জক বিলিরুবিন ও বিলিভার্ডিন উৎপাদন করে।

৬। এদের প্লাজমা আবরণীতে বিদ্যমান অ্যান্টিজেন প্রোটিন মানুষের রক্তের গ্রুপ নির্ধারণ করে।

৭। লোহিত রক্তকণিকা এনজাইমরূপী নাইট্রিক অক্সাইড উৎপাদন করতে পারে যা এন্ডোথেলিয়াল কোষের *L-arginine* এর মতো ব্যবহৃত হয়।

৮। এরা হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস উৎপাদন করে যা রক্তনালির সঙ্কোচনের জন্য সংকেত প্রদান করে।

৯। এরা অনেকসময় দেহের অনাক্রম্যতায় সাড়া প্রদান (immune response) করে। ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হলে লোহিত রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিন থেকে এক ধরনের মুক্ত আয়ন সৃষ্টি হয় যা জীবাণুর কোষ প্রাচীর ভেঙ্গে দিয়ে উহাকে ধ্বংস করে।

(খ) লিউকোসাইট বা শ্বেত রক্তকণিকা

(Leucocytes or White Blood Cells or WBC; Gr. *leucos* = colourless, *kytos* = cell)

রক্তরস এবং লসিকায় বিদ্যমান স্বচ্ছ, নিউক্লিয়াসযুক্ত, অ্যামিবয়েড, দানাদার বা অদানাদার, অনিয়তাকার গঠন বিশিষ্ট রক্তকণিকাকে লিউকোসাইট বা শ্বেত রক্তকণিকা বলে। এদেরকে দেহের ভ্রাম্যমান প্রতিরক্ষাকারী একক (mobile defensive units) বলা হয়।

শ্বেত রক্তকণিকা অ্যামিবয়েড প্রকৃতির হওয়ায় এরা রক্তবাহিকার ভেতর থেকে বের হয়ে সহজেই ব্যাকটেরিয়া ভক্ষণ করতে পারে। এরা মানুষের অনাক্রম্যতন্ত্রেরও অংশ। শ্বেত রক্তকণিকার ক্যানসারকে লিউকেমিয়া (leukemia) বলে। লাল অস্থিমজ্জার হিমাটোপয়টিক মাতৃকোষ (hematopoietic stem cells) হতে মায়েলোপয়সিস (myelopoiesis) প্রক্রিয়ায় শ্বেত রক্তকণিকা সৃষ্টি হয়। এছাড়া প্লীহা হতেও কিছু শ্বেত রক্তকণিকা সৃষ্টি হয়। শ্বেত রক্তকণিকার মৃত্যুর পর অন্যান্য শ্বেত রক্তকণিকা দ্বারা ভক্ষিত হয়।

কোনো রঞ্জক পদার্থ থাকে না বলে এদের শ্বেত রক্তকণিকা নামে ডাকা হয় (প্রকৃতপক্ষে বর্ণহীন)। আকারে এরা লোহিত রক্তকণিকা হতে বড় এবং এদের গড় ব্যাস 7.5-20 মাইক্রোমিটার পর্যন্ত হয়। এদের সাইটোপ্লাজমে বিভিন্ন আকৃতির নিউক্লিয়াস থাকে। রক্তে এদের পরিমাণ খুব কম। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে 6-8 হাজার শ্বেত রক্তকণিকা থাকে অর্থাৎ RBC:WBC=600:1। আয়তনের দিক দিয়ে শ্বেত রক্তকণিকা পরিণত সুস্থ মানুষের রক্তের মাত্র 1%।

রক্তে শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা স্বাভাবিকের চেয়ে অধিক থাকলে তাকে লিউকোসাইটোসিস (leukocytosis) এবং কম থাকেলে তাকে লিউকোপেনিয়া (leukopenia) বলে। রক্তে শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্য কম থাকলে দুর্বল অনাক্রম্যতা প্রকাশ পায় অর্থাৎ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। লিউকেমিয়া (leukamia) ক্যানসারের ক্ষেত্রে লোহিত কণিকা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় কিন্তু শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যায় এবং রোগীর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

কিছু শ্বেত রক্তকণিকা রক্ত থেকে স্থানান্তরিত হয়ে দেহের অন্য কোন কলায় স্থায়ীভাবে অবস্থান করে। যকৃতে বিদ্যমান কাপফার কোষ (Kupffer's cells) এক ধরনের শ্বেত রক্তকণিকা যারা অনাক্রম্যতন্ত্রের অংশ হিসেবে কাজ করে।

রাসায়নিকভাবে শ্বেত রক্তকণিকা নিউক্লিওপ্রোটিন, গ্লাইকোজেন, লিপিড, কোলেস্টেরল, অ্যাস্করবিক অ্যাসিড ও প্রোটিন বিশ্লেষী এনজাইম সমৃদ্ধ। অস্থিমজ্জা, প্লীহা ও লসিকাগ্রন্থি থেকে লিউকোসাইট উৎপন্ন হয়।

শ্বেত রক্তকণিকার প্রকারভেদ

কোষের আকৃতি, নিউক্লিয়াসের গঠন প্রকৃতি ও সাইটোপ্লাজমের অবস্থার উপর ভিত্তি করে শ্বেত রক্তকণিকা প্রধানত দুই প্রকার, যথা-

১। গ্র্যানুলোসাইট বা দানাদার লিউকোসাইট (Granulocytes)

২। অ্যাগ্র্যানুলোসাইট বা অদানাদার লিউকোসাইট (Agranular leucocytes):

CamScanner

১। গ্র্যানুলোসাইট বা দানাদার লিউকোসাইট (Granulocytes): এ ধরনের শ্বেত রক্তকণিকার সাইটোপ্লাজম দানাদার এবং নিউক্লিয়াস ছোট ও খণ্ডায়িত। বর্ণ ধারণ ক্ষমতার ভিত্তিতে এরা তিন ধরনের-

(ক) নিউট্রোফিল (Neutrophils): শ্বেত রক্তকণিকার সর্বাধিকই (60-70%) নিউট্রোফিল ধরনের। এদের সাইটোপ্লাজমে বর্ণ নিরপেক্ষ দানা থাকে যেগুলো ইওসিন রঞ্জকে বেগুনি বর্ণ ধারণ করে। এরা গোলাকার ও 10-15 মাইক্রোমিটার ব্যাস বিশিষ্ট। নিউক্লিয়াস 2-7 খণ্ড বিশিষ্ট যেগুলো সরু ফিতা দ্বারা সংযুক্ত থাকে। প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে এদের সংখ্যা 3000-6000টি। এদের জীবনকাল 12 ঘণ্টা থেকে 3 দিন। এরা ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের সংক্রমণ প্রতিরোধ করে। নিউট্রোফিল অ্যামিবয়েড চলনে সক্ষম এবং প্রয়োজনে এরা সঙ্কোচিত হয়ে কৈশিকনালিকার প্রাচীরে বিদ্যমান কণিকার চেয়ে ছোট ছিদ্র ভেদ করে বিভিন্ন কলায় ও সংক্রমণ স্থানে পৌছাতে পারে। নিউট্রোফিলের এ আচরণকে ডায়াপেডেসিস (diapedesis) বলে। অনাক্রম্য সাড়াদানে ডায়াপেডেসিস একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

(খ) বেসোফিল (Basophils): শ্বেত রক্তকণিকার সবচেয়ে কম অংশ (0.5%) বেসোফিল ধরনের। এরা গোলাকার ও 10-12 মাইক্রোমিটার ব্যাস বিশিষ্ট। এদের সাইটোপ্লাজমে ক্ষারাসক্ত দানা থাকে যারা ইওসিন রঞ্জকে নীল বর্ণ ধারণ করে। এদের নিউক্লিয়াস বিভিন্নভাবে খণ্ডায়িত থাকে। প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে এদের সংখ্যা মাত্র 25-200টি। এদের জীবনকাল 9-18 মাস। এরা হেপারিন (heparin) ও হিস্টামিন (histamine) নামক দুই ধরনের রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ করে। অধিক রক্ত প্রবাহের জন্য হিস্টামিন রক্তনালিকে প্রসারিত করে। হেপারিন রক্তনালিতে রক্তকে জমাট বাঁধতে দেয় না।

(গ) ইউসিনোফিল (Eosinophils): শ্বেত রক্তকণিকার 2-4% ইউসিনোফিল ধরনের। এদের সাইটোপ্লাজমে বিদ্যমান অম্লাসক্ত দানাগুলো ইওসিন রঞ্জকে লাল বর্ণ ধারণ করে। এরা গোলাকার ও 10-15 মাইক্রোমিটার ব্যাস বিশিষ্ট নিউক্লিয়াস 2-3 খণ্ড বিশিষ্ট। প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে এদের সংখ্যা মাত্র 100-400টি। এদের জীবনকাল 3-5 দিন। এরা দেহের অ্যালার্জির বিরুদ্ধে কাজ করে। অ্যালার্জি, পরজীবীর সংক্রমণ, প্লীহা ও স্নায়ুতন্ত্রের রোগের কারণে রক্তে ইউসিনোফিল সংখ্যা বেড়ে যায়।

চিত্র 8.8 বিভিন্ন ধরনের শ্বেত রক্তকণিকা

২। অ্যাগ্র্যানুলোসাইট বা অদানাদার লিউকোসাইট (Agranular leucocytes): এ ধরনের লিউকোসাইটের সাইটোপ্লাজম দানাবিহীন এবং নিউক্লিয়াস বৃহৎ ও অখণ্ডায়িত। এরা দুই ধরনের-

(ক) মনোসাইট (Monocytes): এগুলো অস্থিমজ্জায় সৃষ্ট অনিয়তাকার ও 20-25 মাইক্রোমিটার ব্যাস বিশিষ্ট শ্বেত রক্ত কণিকা। দেহের 2-8% শ্বেতরক্তকণিকা মনোসাইট ধরনের। এদের নিউক্লিয়াস ছোট ও বৃক্ক আকৃতির, সাইটোপ্লাজম বেশি। প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে এদের সংখ্যা মাত্র 100-700টি। এদের জীবনকাল 10-12 দিন। এরা কলার ম্যাক্রোফেজ হিসেবে মৃতকোষ ভক্ষণ করে। মনোসাইট ফ্যাগোসাইটোসিস (phagocytosis) পদ্ধতিতে রোগ জীবাণু ভক্ষণ করে রোগের আক্রমণকে প্রতিহত করে।

(খ) লিম্ফোসাইট (Lymphocytes): এগুলো লসিকাতন্ত্রে সৃষ্ট হয়। এরা গোলাকার ও 7-20 মাইক্রোমিটার ব্যাস বিশিষ্ট। এদের নিউক্লিয়াস বড় এবং সাইটোপ্লাজমের অধিকাংশই দখল করে রাখে। শ্বেত রক্তকণিকার 25%ই

CamScanner

লিম্ফোসাইট। প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে এদের সংখ্যা 1500-2700টি। এদের জীবনকাল 100-120 দিন। এরা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে এবং অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে।

মানব রক্তে তিন ধরনের লিম্ফোসাইট থাকে, যথা- T কোষ, B কোষ এবং NK কোষ।

- **T কোষ:** থাইমাস গ্রন্থির থাইমোসাইটস থেকে সৃষ্টি হয় বলে এদের ***T কোষ*** বা ***T লিম্ফোসাইটস*** বলে। এরা কোষ মাধ্যম অনাক্রম্যতায় (cell-mediated immunity) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- **B কোষ :** অস্থিমজ্জার হিমাটোপয়টিক মাতৃকোষ (HSCs) হতে ***B কোষ*** বা ***B লিম্ফোসাইট*** সৃষ্টি হয়। এরা রক্ত মাধ্যম অনাক্রম্যতায় (humoral immunity) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- **NK কোষ:** NK কোষ বা Natural killer কোষ বিশেষ ধরনের শ্বেত রক্তকণিকা যারা অন্য কোষের জন্য বিষাক্ত এবং অনাক্রম্যতন্ত্রের জন্য বিপদজনক। এরা ভাইরাসের সংক্রমণে খুব দ্রুত সাড়া প্রদান করে এবং সংক্রমণের 3 দিন পর্যন্ত সক্রিয় থাকে। এরপর এরা দেহে টিউমার সৃষ্টি করে।

লিউকোসাইট বা শ্বেত রক্তকণিকার কাজ

১। মনোসাইট ও নিউট্রোফিল ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে রোগের জীবাণু ভক্ষণ করে।

২। লিম্ফোসাইটগুলো অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে রোগ প্রতিরোধ করে, এজন্য এদের **আণুবীক্ষণিক সৈনিক** (microscopic soldier) বলে।

৩। বেসোফিল **হেপারিন** (heparin) তৈরি করে যা রক্তনালির অভ্যন্তরে রক্ততঞ্চন রোধ করে।

৪। দানাদার লিউকোসাইট **হিস্টামিন** (histamine) সৃষ্টি করে যা দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

৫। নিউট্রোফিলের বিষাক্ত দানা জীবাণু ধ্বংস করে।

৬। ইউসিনোফিল রক্তে প্রবেশকৃত কৃমির লার্ভা এবং অ্যালার্জিক অ্যান্টিবডি ধ্বংস করে।

বিভিন্ন ধরনের শ্বেত রক্তকণিকার তুলনামূলক বিবরণ

শ্বেত রক্তকণিকা	আকার ও আকৃতি	সংখ্যা (প্রতি ঘন মি.মি)	নিউক্লিয়াস	জীবনকাল
নিউট্রোফিল	গোলাকার ও 10-15 মাইক্রোমিটার ব্যাস বিশিষ্ট	3000-6000টি	বহুখণ্ড বিশিষ্ট	12 ঘন্টা-3 দিন
বেসোফিল	গোলাকার ও 10-12 মাইক্রোমিটার ব্যাস বিশিষ্ট	25-200টি	দ্বি-খণ্ড বিশিষ্ট	9-18 মাস
ইওসিনোফিল	গোলাকার ও 10-15 মাইক্রোমিটার ব্যাস বিশিষ্ট	100-400টি	দ্বি-খণ্ড/ত্রি-খণ্ড বিশিষ্ট	3-5 দিন
মনোসাইট	অনিয়তাকার ও 20-25 মাইক্রোমিটার ব্যাস বিশিষ্ট	100-700টি	বৃক্ক আকৃতির	10-12 দিন
লিম্ফোসাইট	গোলাকার ও 7-20 মাইক্রোমিটার ব্যাস বিশিষ্ট	1500-2700টি	গোলাকার বা ডিম্বাকার	100-120 দিন

(গ) থ্রোম্বোসাইট বা অণুচক্রিকা (Thrombocytes or Blood platelets):

রক্তে বিদ্যমান বর্ণহীন, ক্ষুদ্র, নিউক্লিয়াসবিহীন, গোলাকার বা ডিম্বাকার বা দণ্ডাকার রক্তকণিকাকে **থ্রোম্বোসাইট বা অণুচক্রিকা** বলে। এগুলো ক্ষুদ্র, গোলাকার বা ডিম্বাকার বা দণ্ডাকার রক্তকণিকা; এদের ব্যাস 2-4 মাইক্রোমিটার। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের প্রতি ঘন মিলিলিটার রক্তে 2.5-5 লক্ষ থ্রোম্বোসাইট থাকে। এগুলো লাল অস্থিমজ্জার **মেগাক্যারিওসাইট** (megakaryocytes) কোষ থেকে সৃষ্টি হয় এবং যকৃত ও প্লীহায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। মানবদেহে প্রতিদিন প্রায় 200 বিলিয়ন বা 20 হাজার কোটি অণুচক্রিকা উৎপন্ন হয়। এদের আয়ুষ্কাল 2.5-9 দিন। প্লীহা ব্যতিত দেহের অন্য কোথাও অণুচক্রিকা সঞ্চিত থাকে না। লোহিত রক্ত কণিকার মতো এদের কোনো নিউক্লিয়াস নেই এবং এরা বিভাজিত হতে পারে না।

CamScanner

অণুচক্রিকার প্রধান রাসায়নিক উপাদান হলো প্রোটিন ও ফসফোলিপিড। এদের সাইটোপ্লাজমে অ্যাকটিন, মায়োসিন, গ্লাইকোজেন, লাইসোসোম এবং ডেন্স ও আলফা দানা থাকে। কোলাজেন ও ফাইব্রিনোজেন প্রোটিন ধারণ করার জন্য এদের প্লাজমা আবরণী চরমভাবে ভাঁজযুক্ত। এরা সহজেই ভেঙ্গে যায় এবং রক্ত তঞ্চনের জন্য প্রয়োজনীয় **থ্রম্বোকাইনেজ** (thrombokinase) এনজাইম সৃষ্টি করে।

অণুচক্রিকার কাজ

১। অণুচক্রিকা ক্ষতস্থানে রক্ত তঞ্চন ঘটায় এবং **হিমোস্ট্যাটিক প্লাগ** (hemostatic plug=blood platelets+plasma proteins) গঠন করে রক্তক্ষরণ বন্ধ করে।

২। **গ্রোথ ফ্যাক্টর** ক্ষরণের মাধ্যমে এরা রক্তনালির ক্ষতিগ্রস্থ এন্ডোথেলিয়াল আবরণ পুনর্গঠন করে।

৩। এরা **সেরাটোনিন** নামক রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন করে যা রক্তনালির সঙ্কোচন ঘটিয়ে রক্তপাত হ্রাস করে।

৪। এরা ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে কার্বন কণা, ইমিউন কমপ্লেক্স, ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসকে ভক্ষণ করে।

৫। এরা হিস্টামিন ও 5HT (5-hydroxytryptamine) সঞ্চয় করে যেগুলো অণুচক্রিকা ভাঙ্গণের সময় মুক্ত হয়।

চিত্র ৪.৫ অণুচক্রিকা

লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা এবং অণুচক্রিকার তুলনামূলক বিবরণ

বৈশিষ্ট্য	লোহিত রক্তকণিকা	শ্বেত রক্তকণিকা	অণুচক্রিকা
১. উৎপত্তিস্থল	যকৃত, প্লীহা ও অস্থিমজ্জা	লাল অস্থিমজ্জা, প্লীহা, লসিকা গ্রন্থি	লাল অস্থিমজ্জা
২. প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে সংখ্যা	পুরুষে-5.4 মিলিয়ন স্ত্রীলোকের 4.8 মিলিয়ন	6-8 হাজার	2.5-5 লক্ষ
৩. নিউক্লিয়াস	অনুপস্থিত	বিদ্যমান	অনুপস্থিত
৪. বর্ণ	লাল বর্ণের	বর্ণহীন	বর্ণহীন
৫. আয়ুষ্কাল	120 দিন	সাধারণত 2-15দিন, তবে লিম্ফোসাইট-100-120 দিন	2.5-9 দিন
৬. গঠন প্রকৃতি	দ্বি-অবতল, চাকতির মতো	গোলাকার বা অনিয়তাকার	অনিয়তাকার
৭. প্রকার	এক প্রকার	পাঁচ প্রকার	এক প্রকার
৮. প্রধান কাজ	অক্সিজেন পরিবহন করা	রোগজীবাণু প্রতিরোধ করা	রক্ত তঞ্চন

রক্ত জমাট বাঁধা বা রক্ততঞ্চন (Blood coagulation)

দেহের কোনো স্থান কেটে গেলে বা আঘাতের ফলে ক্ষত সৃষ্টি হলে সে স্থান হতে রক্তপাত (hemorrhage) ঘটে। যে প্রক্রিয়ায় রক্তনালি থেকে রক্তপাত বন্ধ হয় তাকে হিমোস্ট্যাসিস (hemostasis) বলে। যে প্রক্রিয়ায় রক্ত তার তারল্যতা হারিয়ে অর্ধ তরল পিণ্ড বা ক্লটে (clott) পরিণত হয় তাকে রক্ত জমাট বাঁধা বলে। যে প্রক্রিয়ায় কেটে যাওয়া স্থানে বা ক্ষতস্থানের রক্ত জমাট বেঁধে দেহ হতে অবাঞ্ছিত রক্তপাত বন্ধ হয় তাকে রক্ততঞ্চন (Blood coagulation) বলে। মানবদেহে রক্ততঞ্চন হিমোস্টেসিসের একটি অংশ। রক্তের প্লাজমায় বিদ্যমান ফাইব্রিনোজেন নামক দ্রবণীয় প্রোটিন অদ্রবণীয় ফাইব্রিন জালকে পরিণত হয়ে রক্ততঞ্চন ঘটায়। রক্ততঞ্চন একটি জটিল প্রক্রিয়া।

CamScanner

এতে প্রায় 13টি রক্ততঞ্চন ফ্যাক্টর (coagulation factors) বা উপাদান অংশগ্রহণ করে। এ ফ্যাক্টরগুলো রক্তকণিকা ও প্লাজমায় বিদ্যমান থাকে। রক্ততঞ্চনের ফ্যাক্টরগুলো নিচের ছকে উল্লেখ করা হলো:

রক্ততঞ্চন ফ্যাক্টরের তালিকা

ফ্যাক্টর	নাম	কাজ
ফ্যাক্টর I	ফাইব্রিনোজেন	আঠালো প্রোটিন যা রক্ততঞ্চনের সময় ফাইব্রিন সৃষ্টি করে।
ফ্যাক্টর II	প্রোথ্রোম্বিন	ভিটামিন K নির্ভর ফ্যাক্টর যা রক্ততঞ্চনের সময় থ্রোম্বিন সৃষ্টি করে।
ফ্যাক্টর III	থ্রোম্বোপ্লাস্টিন	টিস্যু ফ্যাক্টর যা রক্ততঞ্চনের সময় থ্রোম্বিন সৃষ্টি করে।
ফ্যাক্টর IV	ক্যালসিয়াম আয়ন	অধাতব আয়ন যা রক্ততঞ্চনের সময় ফাইব্রিন পলিমার গঠন করে।
ফ্যাক্টর V	প্রোঅ্যাকসেলারিন	ল্যাবাইল ফ্যাক্টর যা কো-ফ্যাক্টর হিসেবে রক্ততঞ্চনের সময় থ্রোম্বিন সৃষ্টি করে।
ফ্যাক্টর VII	প্রোকনভারটিন	স্ট্যাবল ফ্যাক্টর, যা টিস্যু ফ্যাক্টরের সাথে থ্রম্বোপ্লাস্টিন গঠন করে।
ফ্যাক্টর VIII	অ্যান্টিহিমোফিলিক ফ্যাক্টর	কো-ফ্যাক্টর যা Ca^{2+} আয়ন ও ফসফোলিপিডের সাহায্যে ফ্যাক্টর X কে সক্রিয় করে।
ফ্যাক্টর IX	ক্রিসমাস ফ্যাক্টর	সক্রিয় এনজাইম হিসেবে থ্রম্বোপ্লাস্টিন উৎপাদনে সহায়তা করে।
ফ্যাক্টর X	স্টুয়ার্ড ফ্যাক্টর	সক্রিয় এনজাইম হিসেবে প্রোথ্রোম্বিনকে সক্রিয় করে।
ফ্যাক্টর XI	প্লাজমা থ্রম্বোপ্লাস্টিন	সক্রিয় এনজাইম হিসেবে ফ্যাক্টর IX কে সক্রিয় করে।
ফ্যাক্টর XII	হ্যাগম্যান ফ্যাক্টর	ক্যালিক্রেইনকে সক্রিয় করে এবং প্লাজমাকাইনিন নামক পদার্থ উৎপাদন করে।
ফ্যাক্টর XIII	ফাইব্রিন স্ট্যাবিলাইজিং ফ্যাক্টর	Ca^{2+} আয়নের সাহায্যে তরল ফাইব্রিন পলিমারকে অদ্রবনীয় ও দৃঢ় ফাইব্রিন জালকে পরিণত করে।

* প্রকৃতপক্ষে ফ্যাক্টর VII হলো ফ্যাক্টর VI এর সক্রিয় অবস্থা, এজন্য VI কে তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়।

রক্ততঞ্চন প্রক্রিয়া (Mechanism of Blood clotting)

রক্ততঞ্চন ফ্যাক্টরগুলোর ধারাবাহিক কার্যকারিতায় ক্ষতস্থানে রক্ত জমাট বাঁধে। নিম্নে রক্ততঞ্চন প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হলো-

১। আঘাত প্রাপ্তির পর ক্ষতস্থানে রক্তনালি সঙ্কোচিত হয়ে রক্তপ্রবাহ কমিয়ে দেয়। রক্তের অণুচক্রিকা রক্ততঞ্চন প্রক্রিয়ার সূচনা করে।

২। ক্ষতস্থানের অণুচক্রিকা এবং টিস্যু উভয়েই বিভিন্ন টিস্যু ফ্যাক্টর ও Ca^{++} উপস্থিতিতে থ্রোম্বোপ্লাস্টিন (thromboplastin) নামক এনজাইম নিঃসরণ করে।

৩। থ্রোম্বোপ্লাস্টিন, Ca^{++} এবং ফ্যাক্টর VII, VIII, IX, X-এর উপস্থিতিতে প্লাজমায় বিদ্যমান নিষ্ক্রিয় প্রোথ্রোম্বিনকে সক্রিয় থ্রোম্বিন (active thrombin) এ পরিণত করে। এরা ক্ষতস্থানে অস্থায়ীভাবে রক্ত জমাট করে।

৪। এ থ্রোম্বিন প্লাজমায় দ্রবীভূত থাকা প্রোটিন ফাইব্রিনোজেন (fibrinogen) এর সাথে বিক্রিয়া করে সেগুলোকে অদ্রবণীয় আঁশের মতো ফাইব্রিন মনোমার (fibrin monomer) বা হিমোস্ট্যাটিক প্লাগ-এ পরিণত করে।

৫। ফাইব্রিন মনোমারগুলো পরস্পর সংযুক্ত হয়ে ফাইব্রিন পলিমার গঠন করে এবং পরিশেষে ফাইব্রিন বা ফাইব্রিল (fibrin or fibrils) জালকের সৃষ্টি করে। ফ্যাক্টর XIII ফাইব্রিন জালক সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে।

৬। ফাইব্রিন বা ফাইব্রিল জালকে রক্তকণিকা আটকে গিয়ে তঞ্চন পিণ্ড গঠন করে ফলে রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায়।

উপরোক্ত ধারাবাহিক রক্ততঞ্চন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। মানুষের রক্ততঞ্চনের স্বাভাবিক সময় 4-5 মিনিট অর্থাৎ মানুষের স্বাভাবিক রক্তক্ষরণকাল 4-5 মিনিট। রক্ততঞ্চনের পর এর জমাট পদার্থগুলোকে অপসারণ করলে যে জলীয়

CamScanner

পদার্থ থাকে তাকে সিরাম (serum) বলে। সিরামের গঠন প্লাজমার মতোই তবে এতে ফাইব্রিনোজেন ও তঞ্চন ফ্যাক্টর II, V ও VIII থাকে না এবং এতে সেরোটোনিন ঘনত্ব বেশি। সেরোটোনিন রক্তনালির সঙ্কোচন ঘটিয়ে রক্তপাত হ্রাস করে। রক্ত সিরাম নিয়ে অধ্যয়নের বিষয়কে সেরোলজি (serology) বলা হয়।

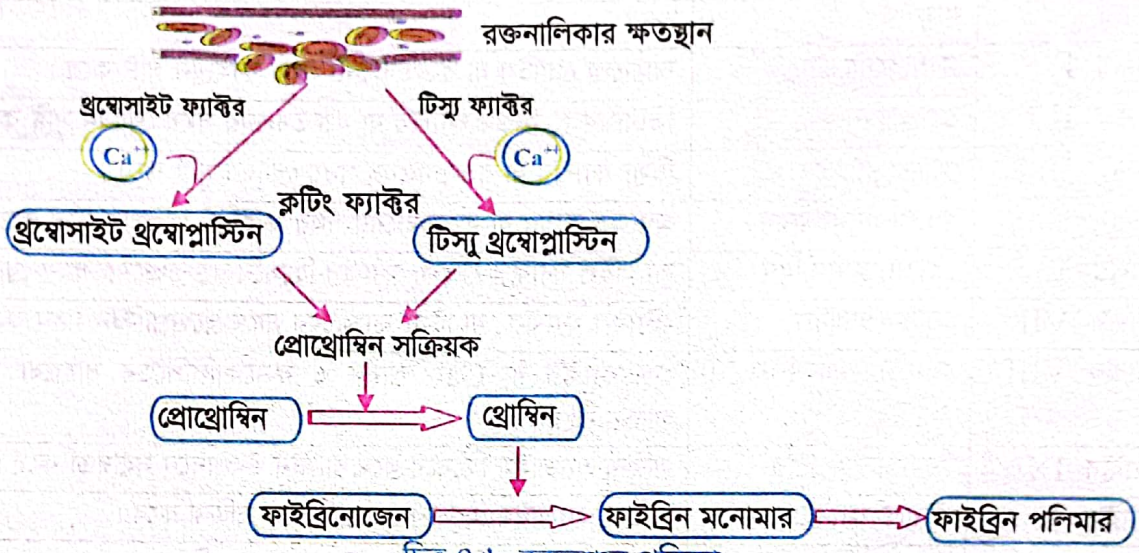

চিত্র ৪.৬ রক্ততঞ্চন প্রক্রিয়া

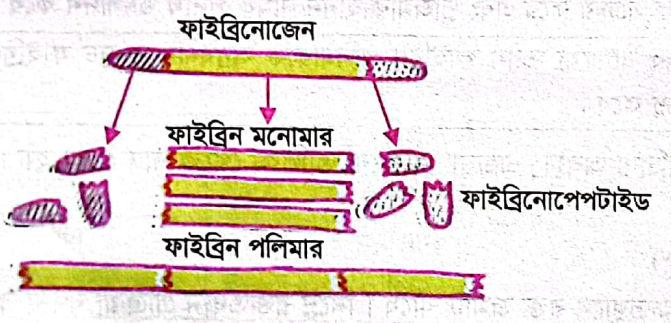

চিত্র ৪.৭ ফাইব্রিন পলিমার সৃষ্টি

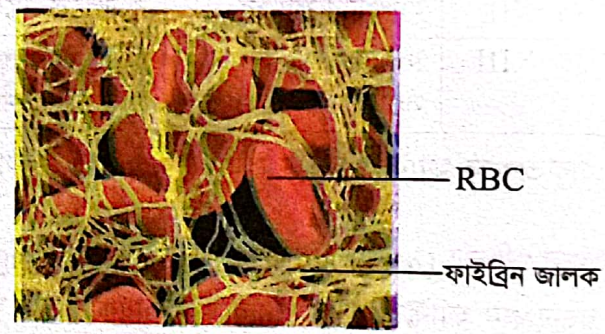

চিত্র ৪.৮ ফাইব্রিন জালকে রক্তকণিকা আবদ্ধ

রক্ততঞ্চনে কিছু অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। অনেকের ক্ষতস্থানে রক্ত জমাট না বেঁধে অবিরাম রক্তক্ষরণ ঘটতে থাকে। এ ধরনের রক্ততঞ্চন অস্বাভাবিকতাকে হিমোফিলিয়া বা ইমিউন থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া (hemophilia or immune thrombocytopenia) বলে। রক্ততঞ্চন অস্বাভাবিক দ্রুত সময়ে সংঘটিত হয়ে থ্রম্বোসিস (thrombosis) সমস্যার সৃষ্টি করে । অনেকসময় ক্ষতস্থানে রক্ত জমাট বাধাঁর পর উহা ভেঙ্গে গিয়ে শিরা বা ধমনীতে ব্লক সৃষ্টি করে যা স্ট্রোক কিংবা হার্ট অ্যাটাকের কারণ হতে পারে। এ অবস্থাকে এমবোলিজম (embolisms) বলে। স্থূলতা, গর্ভধারণ, ধূমপান, কিছু ক্যানসার, 60 বছরের অধিক বয়স, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, উচ্চ কোলেস্টেরল মাত্রা, প্রভৃতি মানুষের রক্ততঞ্চন প্রক্রিয়ার ঝুঁকির কারণ।

স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তনালিতে রক্ত জমাট বাঁধে না কেন?

নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণে রক্তনালির অভ্যন্তরে রক্ত জমাট বাঁধে না -

১। রক্ত প্রচণ্ড গতিতে অবিরাম প্রবহমান থাকে।

২। মানুষের রক্ত ও অন্যান্য কলাতে প্রায় 50 ধরনের উপাদান বা ফ্যাক্টর আছে যেগুলো রক্ততঞ্চন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। এদেরকে দুই ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়, যথা-

(ক) প্রোকোয়াগুলেন্ট ফ্যাক্টর- এরা রক্ততঞ্চনকে উদ্দীপিত করে এবং

(খ) অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ফ্যাক্টর-এরা রক্ততঞ্চনকে প্রতিরোধ করে।

CamScanner

রক্ততঞ্চন নির্ভর করে দেহে প্রোকোয়াগুলেন্ট ও অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট উপাদানসমূহের ভারসাম্যের উপর। স্বাভাবিক অবস্থায় অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ফ্যাক্টরগুলো প্রোকোয়াগুলেন্টের উপর প্রকট। ফলে রক্তনালির অভ্যন্তরে রক্ত জমাট বাঁধে না।

৩। রক্তনালির এন্ডোথেলিয়াম প্রাচীর অত্যন্ত মসৃণ থাকায়।

৪। রক্তে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ফ্যাক্টর হেপারিন থাকায়।

৫। সক্রিয় কোয়াগুলেন্ট ফ্যাক্টরগুলোকে যকৃত কর্তৃক সর্বদা অপসারিত হওয়ায়।

রক্তনালির কোনো স্থান ফেটে গেলে বা ক্ষত সৃষ্টি হলে সে স্থানের প্রোকোয়াগুলেন্ট ফ্যাক্টরগুলো অধিক সক্রিয় হয়ে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টের ক্ষমতাকে অতিক্রম করে এবং সেখানে রক্ততঞ্চন প্রক্রিয়া শুরু হয়।

রক্ততঞ্চনের তাৎপর্য (Significance of blood coagulation)

১। রক্ততঞ্চন মানবদেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া যা আঘাতপ্রাপ্ত ছিড়ে যাওয়া রক্তনালি হতে রক্তপাত বন্ধের মাধ্যমে দেহকে বিশাল ক্ষতি এমনকি মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা করে।

২। রক্ততঞ্চনের সময় জমাটকৃত রক্তে কিছু আক্রমণকারী ক্ষতিকর জীবাণু আবদ্ধ হয়ে দেহে প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হয়।

৩। রক্ততঞ্চনের সময় কিছু জীবাণুরোধী পদার্থ যেমন- বিটা-লাইসিন (beta-lysine) নামক অ্যামিনো অ্যাসিড সৃষ্টি হয় যা অনেক গ্রাম পজেটিভ ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে।

৪। দেহের দূর্বল প্রকৃতির রক্ততঞ্চন প্রক্রিয়া অনেকসময় রক্তনালিকার সামান্য আঘাত থেকে অতিমাত্রায় রক্তক্ষরণ ঘটিয়ে দেহকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে।

৫। মস্তিষ্কের ধমনিতে রক্ত জমাট বাঁধলে স্ট্রোকের কারণ এবং হৃৎপিণ্ডের ধমনিতে রক্ত জমাট বাঁধলে হার্ট অ্যাটাকের কারণ ঘটায়।

৬। মানুষের পরিপাকনালির রক্তনালিতে রক্ত জমাট বাঁধলে পেটে তীব্র ব্যাথা অনুভূত হয় এবং ব্যাপক বমির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

প্লাজমা এবং সিরামের মধ্যে পার্থক্য

প্লাজমা এবং সিরাম উভয়েই রক্তের তরল অংশ হলেও এদের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, যেমন-

প্লাজমা	সিরাম
১। রক্তের স্বাভাবিক জলীয় অংশকে প্লাজমা বলে।	১। তঞ্চনের পর প্রাপ্ত রক্তের জলীয় অংশকে সিরাম বলে।
২। এতে সকল ধরনের রক্তকণিকা বিদ্যমান।	২। এতে সকল ধরনের রক্তকণিকা অনুপস্থিত।
৩। ফাইব্রিনোজেনসহ সকল তঞ্চন ফ্যাক্টর বিদ্যমান থাকে।	৩। ফাইব্রিনোজেন ও তঞ্চন ফ্যাক্টর II, V ও VIII থাকে না।
৪। এর 90% পানি।	৪। এর 92-95% পানি।
৫। সেরোটোনিন ঘনত্ব কম।	৫। সেরোটোনিন ঘনত্ব বেশী।
৬। এর শেলফ লাইফ দীর্ঘ অর্থাৎ দীর্ঘদিন (প্রায় 10 বছর) সংরক্ষণ করা যায়।	৬। এর শেলফ লাইফ ছোট অর্থাৎ অল্পদিন (মাত্র কয়েক মাস) সংরক্ষণ করা যায়।
৭। এটি রেচন বর্জ্য পরিবহনের প্রধান মাধ্যম।	৭। এটি বিভিন্ন আয়নের প্রধান উৎস।
৮। রক্ত থেকে এটি সংগ্রহের জন্য অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট প্রয়োজন হয়।	৮। রক্ত থেকে এটি সংগ্রহের জন্য অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট প্রয়োজন হয় না।

CamScanner

ব্যবহারিক: রক্তের স্লাইড পর্যবেক্ষণ

রক্তের প্রলেপ তৈরি করা (Preparation of Blood Smear)

❑ প্রয়োজনীয় উপকরণ

জীবাণুমুক্ত সূঁচ, পরিষ্কার স্লাইড, রক্ত, 70% অ্যালকোহল, পাতিত পানি, ড্রপার, তুলা, স্পিরিট, অণুবীক্ষণ যন্ত্র এবং লেইসমেন'স ব্লু (Leishman's blue) অথবা রাইটস স্টেইন (Wright's stain).

❑ কার্যপ্রণালি

১। পরিষ্কার তুলায় স্পিরিট লাগিয়ে বাম হাতের অনামিকা আঙ্গুলের অগ্রভাগ জীবাণুমুক্ত কর।

২। জীবাণুমুক্ত সূঁচ দ্বারা খোঁচা দিয়ে আঙ্গুল থেকে রক্ত বের কর।

৩। একটি পরিষ্কার শুষ্ক স্লাইডের এক প্রান্তের নিকটে এক বা দুই ফোটা রক্ত নাও।

৪। অতঃপর অন্য একটি পরিষ্কার স্লাইডকে রক্ত স্লাইডের মসৃণ তলে স্থিরভাবে স্থাপন করে রক্তের সংস্পর্শে আন এবং 30°-45° কোণে 4.9 নং চিত্রের অনুরূপভাবে সামনের দিকে ঠেলে দাও।

৫। এতে প্রথম স্লাইডের উপর রক্তের একটি পাতলা প্রলেপ তৈরি হবে।

৬। রক্ত প্রলেপের স্লাইডটি বাতাসে শুকাও এবং এরপর 70% অ্যালকোহলে ধুয়ে স্লাইডটি পুনরায় বাতাসে শুকাও।

৭। অতঃপর স্লাইডের রক্ত প্রলেপের উপর কয়েক ফোটা লেইসমেন'স ব্লু অথবা রাইটস স্টেইন দিয়ে রঞ্জিত কর। এক বা দুই মিনিট পর পাতি পানি দিয়ে স্লাইডটি পানি দিয়ে ধুয়ে অতিরিক্ত রং ধুয়ে ফেল। রক্ত প্রলেপটি গোলাপি বর্ণ ধারণ না করা পর্যন্ত বার বার ধুতে হবে।

৮। স্লাইডটি বাতাসে শুকিয়ে অণুবীক্ষণযন্ত্রে পর্যবেক্ষণ কর।

❑ সতর্কতা

১। সূঁচ অবশ্যই জীবাণুমুক্ত হতে হবে।

২। একজনের ব্যবহৃত সূঁচ অন্যজনে ব্যবহার করা যাবে না।

৩। আঙ্গুলে দেয়া স্পিরিট সম্পূর্ণরূপে শুকানোর পর রক্ত নিতে হবে।

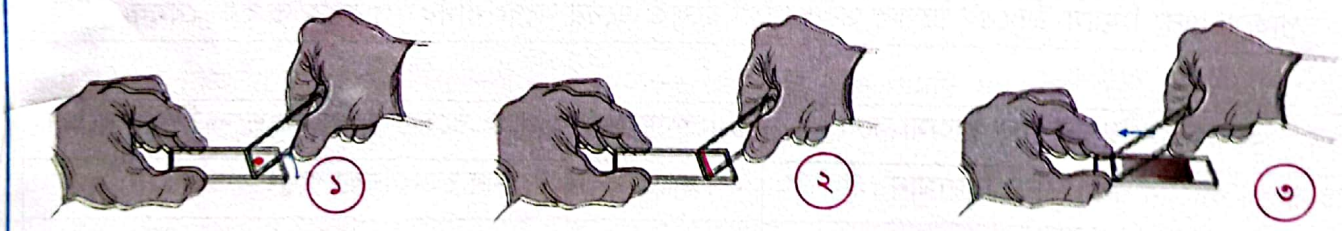

চিত্র ৪.৯ রক্তের প্রলেপ তৈরিকরণ

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১। রক্তে প্লাজমা ও তিন ধরনের রক্তকণিকা বিদ্যমান।

২। শ্বেত রক্তকণিকা ও অনুচক্রিকার সংখ্যা লোহিত রক্ত কণিকা হতে অনেক কম।

৩। লোহিত রক্তকণিকা নিউক্লিয়াসবিহীন, দ্বিঅবতল ও গোলাকৃতির।

৪। শ্বেত রক্তকণিকা বৃহৎ, অনিয়তাকার ও খণ্ডিত নিউক্লিয়াসযুক্ত।

৫। অনুচক্রিকা ক্ষুদ্রাকৃতির ও নিউক্লিয়াস বিহীন।

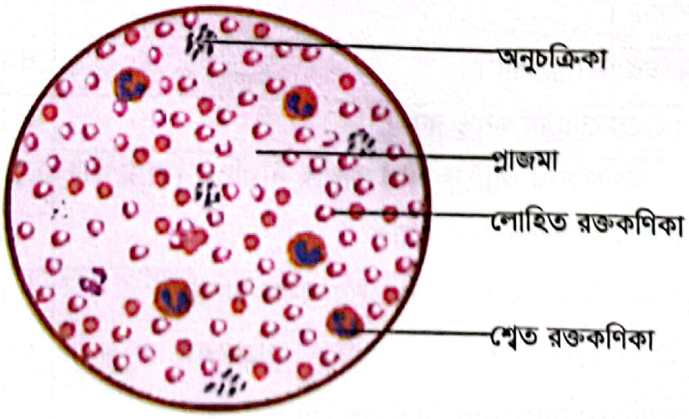

চিত্র ৪.১০ মানুষের রক্তের স্লাইড

CamScanner

৪.২ লসিকা (Lymph)

লসিকা (Lymph; Lt. *lympha* = water goddess) এক ধরনের পরিবর্তিত কলারস যা কৈশিক নালিকার প্রাচীর ভেদ করে বের হয়ে আন্তঃকোষীয় স্থানে অবস্থান করে দেহকোষকে স্ফীত রাখে। লসিকা বা লসিকা রস ঈষৎ ক্ষারধর্মী, স্বচ্ছ হলুদ বর্ণের তরল পদার্থ যা পাতলা প্রাচীর বিশিষ্ট লসিকাজালিকা, লসিকানালি এবং লসিকা-গণ্ডের (lymph node) সমন্বয়ে গঠিত লসিকাতন্ত্রের মাধ্যমে দেহে একমুখী প্রবাহে প্রবাহিত হয়। মানবদেহে লসিকার পরিমাণ প্রায় রক্তের দ্বিগুণ, 10-12 লিটার। লসিকার pH 7.4 - 9, আপেক্ষিক গুরুত্ব 1.01-1.016।

লসিকা গঠন প্রক্রিয়া

দেহ কোষের চারপাশে বিদ্যমান ইন্টারস্টিশিয়াল তরল (interstitial fluid) থেকে লসিকা সৃষ্টি হয়। ধামনিক রক্ত কৈশিক ধমণিতে পৌঁছালে এর অধিকাংশই কৈশিক শিরাতে প্রবাহিত হয়। প্রায় 10% রক্তরস বা প্লাজমা কৈশিকনালিকা থেকে বের হয়ে দেহ কোষের চারদিকে ইন্টারস্টিশিয়াল তরল হিসেবে অবস্থান করে। এ তরল লসিকা নালিকায় প্রবেশ করে লসিকায় পরিণত হয়। লসিকা গঠন প্রক্রিয়াকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় লিম্ফোজেনেসিস (lymphogenesis) বলা হয়।

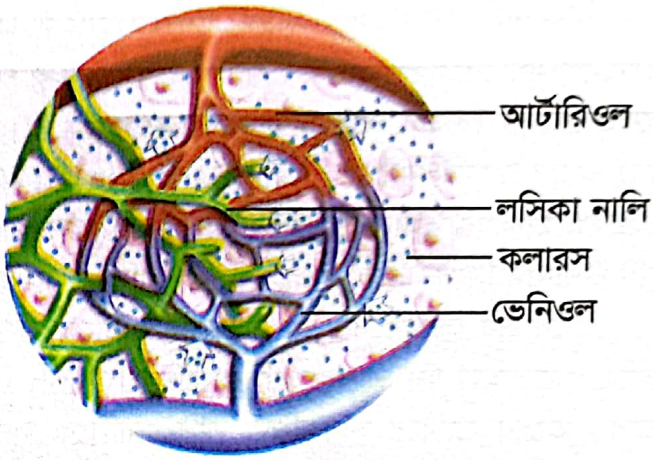

চিত্র ৪.১১ লসিকানালির উৎপত্তিস্থল

লসিকার উপাদান

১। পানি: প্রায় 94%

২। কোষ: লসিকাতে লিম্ফোসাইট-500-75000/ml^3 (T-Lymphocytes and B-Lymphocytes) বিদ্যমান থাকে। এ ছাড়া কিছু অণুচক্রিকাও থাকে। লোহিত রক্তকণিকা অনুপস্থিত।

৩। কঠিন পদার্থ: প্রায় 6%

- **লিপিড:** প্রধানত কাইলোমাইক্রন হিসেবে থাকে যাতে ট্রাইগ্লিসারাইড ও ফসফোলিপিড বিদ্যমান। ক্ষুধার্ত অবস্থায় লসিকাতে ফ্যাটের পরিমাণ কম থাকে। অধিক চর্বিযুক্ত খাবার খেলে লসিকাতে ফ্যাটের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং লসিকাকে দুধের মতো সাদা দেখায়। এ ধরনের লসিকাকে **কাইল** (chyle) বলে।
- **প্রোটিন:** প্রধানত অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন, তঞ্চন ফ্যাক্টর, টিস্যু প্রোটিন, এনজাইম, অ্যান্টিবডি ইত্যাদি।
- **রেচন বর্জ্য:** ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, ক্রিয়েটিনিন।
- **খনিজ:** সোডিয়াম, ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, বাইকার্বনেট ইত্যাদির আয়ন।
- **অন্যান্য বস্তু:** গ্লুকোজ, জীবাণু, ক্যানসার কোষ; লসিকাতে অধিক পরিমাণে CO_2 দ্রবীভূত থাকে।

লসিকার কাজ

১। লসিকা দেহে একটি মধ্যস্থতাকারী (mediator) তরল হিসেবে কাজ করে। এটি রক্ত থেকে অক্সিজেন, খাদ্যসার, হরমোন ইত্যাদি কোষে পরিবহন করে এবং কোষ থেকে CO_2 ও বিপাকীয় বর্জ্য রক্তে নিয়ে আসে।

২। লসিকা antigen-presenting cells (APCs) পরিবহন করে লসিকা গ্রন্থিতে নিয়ে যায় যেখানে অনাক্রম্যতা সাড়াদানের সূচনা ঘটে।

৩। লসিকা লিম্ফ নোড ও অস্থিমজ্জার মধ্যে শ্বেত রক্তকণিকা আদান-প্রদান করে।

৪। লসিকায় বিদ্যমান শ্বেত রক্তকণিকা জীবাণু ধ্বংস করে এবং অ্যান্টিজেন উৎপাদন করে দেহের রোগ প্রতিরোধ করে।

৫। লসিকা অন্ত্র থেকে চর্বি ও চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন শোষণ করে।

CamScanner

৬। যেসব লিপিড কণা, প্লাজমা প্রোটিন ও হরমোন অণু কৈশিকনালিকার সূক্ষ্ম ছিদ্র অতিক্রম করতে পারে না সেগুলো লসিকার মাধ্যমে পরিবাহিত হয়।

৭। কোনো কারণে রক্ত সংবহনতন্ত্রে রক্তের পরিমাণ কমে গেলে লসিকাতন্ত্র থেকে লসিকা দ্রুত রক্তনালিতে প্রবেশ করে রক্তের আয়তন ঠিক রাখে।

৮। আন্তঃকোষীয় উন্মুক্ত স্থান থেকে অধিকাংশ প্রোটিন অণু লসিকার মাধ্যমে রক্তে ফিরে আসে।

৯। দেহের যেসব কলায় রক্ত পৌঁছাতে অক্ষম লসিকার মাধ্যমে সেসব কলায় পুষ্টি ও অক্সিজেন পরিবাহিত হয়।

১০। লসিকা দেহের বিভিন্ন অঙ্গে কলার গাঠনিক অখণ্ডতা রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রাখে।

লসিকাতন্ত্র (Lymphatic System)

লসিকানালি ও লসিকা গ্রন্থির সমন্বয়ে গঠিত যে তন্ত্রের মাধ্যমে সমগ্র দেহে লসিকা রস প্রবাহিত হয় তাকে লসিকাতন্ত্র বলে। ডেনিস বিজ্ঞানী ওলাস রুডবেক (Olaus Rudbeck) এবং থমাস বার্থোলিন (Thomas Bartholin) 1760 সালে সর্বপ্রথম মানুষের লসিকাতন্ত্রের বিবরণ দেন। লসিকাতন্ত্র প্রধান দুটি উপাদান নিয়ে গঠিত, যথা- লসিকা নালি ও লসিকা গ্রন্থি।

❑ যে সব বিশেষ ধরনের নালিকার মাধ্যমে লসিকা সমগ্র দেহে পরিবাহিত হয় তাদের লসিকানালি (lymph vessels) বলে। অন্ত্রের প্রাচীরে সুবিকশিত লসিকানালিকে ল্যাকটিয়েল (lacteals) বলে।

❑ লসিকানালিতে কিছুটা পর পর এক ধরনের গোলাকার বা বৃক্কাকৃতি স্ফীতি বা গ্রন্থি থাকে। এদের লসিকা গ্রন্থি বা লসিকা গণ্ড (Lymph glands or lymph nodes) বলে। মানবদেহে এদের সংখ্যা অনেক, প্রায় 400-700। থাইমাস (thymus), প্লীহা (spleen), টনসিল (tonsil), অ্যাডেনয়েড (adenoid) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য লসিকাগ্রন্থি।

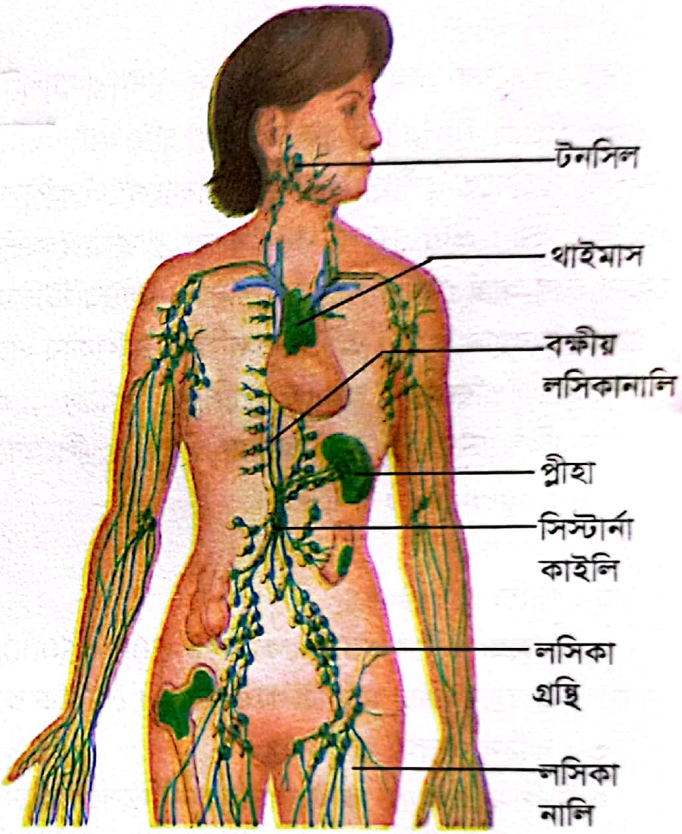

চিত্র ৪.১২ মানুষের লসিকাতন্ত্র

লসিকাগ্রন্থিগুলো যান্ত্রিক ছাঁকুনি হিসেবে কাজ করে এবং লিম্ফোসাইট নামক শ্বেত রক্তকণিকা সৃষ্টি করে। মানবদেহের ঘাড় (neck), বগল (armpit) ও কুঁচকিতে (groin) অধিক সংখ্যক লসিকাগ্রন্থি থাকে। মানুষ ফাইলেরিয়া কৃমি *Wuchereria bancrofti* দ্বারা আক্রান্ত হলে লসিকানালি ও লসিকা গ্রন্থিগুলোতে লসিকা প্রবাহ বাধাগ্রস্থ হয়। ফলে সংশ্লিষ্ট অঙ্গের লসিকানালি ও গ্রন্থিগুলো অস্বাভাবিকভাবে ফুলে যায়। এরোগকে গোদ রোগ বা ফাইলেরিয়া বা এলিফ্যানথিয়াসিস (elephantiasis) বলে।

থাইমাস (Thymus)

থাইমাস একটি বিশেষ ধরনের লসিকাগ্রন্থি যা বক্ষগহ্বরে শ্বাসনালি ও উরঃফলকের মাঝে, হৃৎপিণ্ডের সামনে অবস্থিত এবং মানব অনাক্রম্যতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি পিরামিড আকৃতির গঠন বিশেষ যা দুটি খণ্ডক নিয়ে গঠিত। থাইমাসের প্রতিটি খণ্ডক ক্যাপস্যুলে আবদ্ধ থাকে এবং কেন্দ্রীয় মেডুলা (medulla) ও বাইরের কর্টেক্স (cortex) নিয়ে গঠিত। মানব শিশু জন্মের সময় থাইমাস গোলাপী-ধূসর বর্ণের, নরম, লোবিউলযুক্ত, 4-6 ×2.5-5×1 সেন্টিমিটার ঘন আয়তন বিশিষ্ট। শিশু ও প্রাক-বয়ঃসন্ধিকালিন সময়ে থাইমাস আকারে সবচেয়ে বড় ও সক্রিয় থাকে। বয়ঃসন্ধিকালিন সময় থেকে এটি আকারে ছোট ও নিষ্ক্রিয় হতে থাকে এবং প্রাপ্তবয়স্ক মানুষে সংক্ষিপ্ত চর্বিময় কলায় (fatty tissue) পরিণত হয়।

CamScanner

থাইমাস অন্যান্য লসিকাগ্রন্থি থেকে একটু ভিন্ন ধরনের কারণ এতে কোনো লসিকানালি থাকে না। থাইমাস মূলত অপরিপক্ক T কোষ বা T লিম্ফোসাইট বা থাইমোসাইট (thymocytes) এবং এপিথেলিয়াল কোষ (epithelial cells) দ্বারা গঠিত। এছাড়া এতে সামান্য পরিমাণ B কোষ বা B লিম্পোসাইট (B lymphocyte) থাকে।

থাইমাসের প্রধান কাজ হলো T লিম্ফোসাইট উৎপাদন ও পরিপক্ক করা। T লিম্ফোসাইট দেহের কোষ-নির্ভর অনাক্রম্যতন্ত্রের অপরিহার্য অংশ যেগুলো বহিরাগত যে কোনো জীবাণুর শনাক্তকরণ ও বিনাশে তাৎক্ষণিক ভূমিকা পালন করে। জ্যাকুয়েস মিলার (Jacques Miller, 1961) সর্বপ্রথম থাইমাসের অনাক্রম্যমূলক কাজের ভূমিকা সম্পর্কে বিবরণ দেন। এছাড়া থাইমাস থেকে থাইমুলিন (thymulin), থাইমোসিন (thymosin), মেলাটোনিন (melatonin) ইত্যাদি হরমোন ক্ষরিত হয় যেগুলো লিম্ফোসাইট কোষের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে। শিশু অবস্থায় সৃষ্ট লিম্ফোসাইট কোষগুলো লসিকাতন্ত্রে সাড়াজীবন সক্রিয় থাকে।

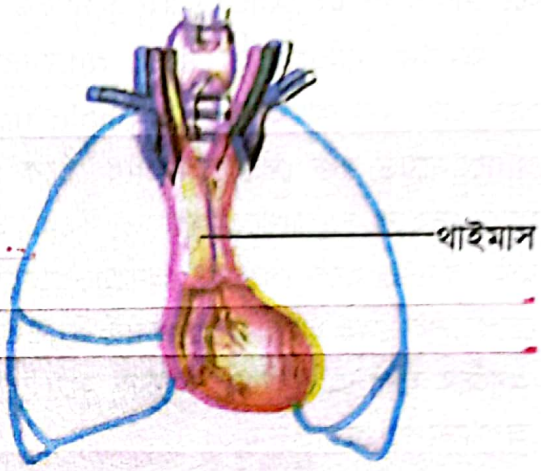

চিত্র ৪.১৩ থাইমাসের অবস্থান

প্লীহা (Spleen)

প্লীহা মানবদেহের সবচেয়ে বড় লসিকা গ্রন্থি। দেহতরলের ভারসাম্য রক্ষায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলেও মানুষ এটি ছাড়াও বাঁচতে পারে। প্লীহা পাঁজরের নিচে এবং পাকস্থলির উপরে, উদরের বাম উর্ধ্ব প্রকোষ্ঠে অবস্থান করে। পরিণত মানুষের প্লীহা কালচে বর্ণের নরম, মুষ্টি আকৃতির প্রায় 13×8×3 সেন্টিমিটার ঘন আয়তন বিশিষ্ট এবং ওজনে প্রায় 150-200 গ্রাম। অণুজীব দ্বারা সংক্রমিত হলে কিংবা আঘাত প্রাপ্ত হলে প্লীহা ফুলে যায় কিংবা আকারে বড় হয়ে যায়। প্লীহার এ অবস্থাকে স্প্লিনোম্যাগালি (splenomegaly) বলে।

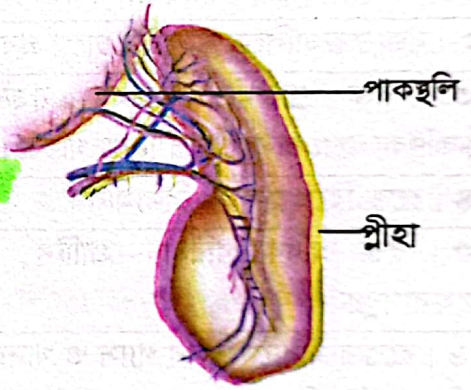

চিত্র ৪.১৪ প্লীহার অবস্থান

প্লীহার কাজ

১। মানব ভ্রূণে প্লীহা সকল ধরনের রক্তকণিকা উৎপাদন করে।

২। পরিণত মানুষের প্লীহাকে রক্তের রিজার্ভার বা ব্লাড ব্যাংক বলা হয় এবং এটি প্রায় 300 মিলিলিটার রক্ত জমা রাখে।

৩। প্লীহা রক্তের প্রধান ছাঁকুনি হিসেবে কাজ করে এবং রক্তে বিভিন্ন কণিকার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

৪। অধিকাংশ লোহিত রক্তকণিকা প্লীহায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় বলে একে লোহিত রক্তকণিকার কবরস্থান বলা হয়।

৫। এটি জীবাণু ধ্বংস করে রোগ প্রতিরোধে অংশ গ্রহণ করে।

৬। প্লীহা অপসোনিন (opsonin), প্রোপারডিন (properdin) ও টাফটসিন (tuftsin) প্রোটিন উৎপাদন করে।

টনসিল (Tonsil)

মুখ হা করলে গলার ভেতরে ডান ও বাম দিকে ছোট বলের মতো যে গঠন দেখা যায় তার নাম টনসিল। টনসিল এক ধরনের লিম্ফ নোড বা লসিকা গ্রন্থি। এরা জীবাণু আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রথম সারির প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এরা প্রচুর পরিমাণে লিম্ফোসাইট সৃষ্টি করে যারা মুখে প্রবেশকৃত ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তবে অনেকসময় টনসিল নিজে ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ফুলে যায়। একে টনসিলাইটিস (tonsillitis) বা টনসিলের প্রদাহ বলে।

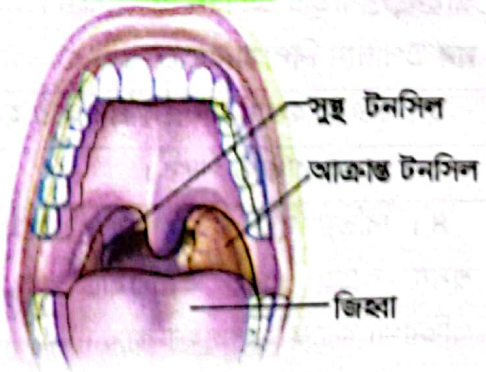

চিত্র ৪.১৫ টনসিলের অবস্থান

CamScanner

অ্যাডেনয়েড (Adenoid)

নাসিকা গহ্বরের পেছনে বিদ্যমান এক ফালি লসিকা কলাকে অ্যাডেনয়েড বলে। মানবদেহে জন্মের সময় অ্যাডেনয়েড বিদ্যমান থাকে এবং সাত বছরের নিচের বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে এর দৈর্ঘ্য 18 মিলিমিটার হয়ে থাকে। বয়োঃসন্ধির শুরুতে অ্যাডেনয়েড সঙ্কোচিত হতে থাকে এবং প্রাপ্তবয়স্ক অধিকাংশ মানুষের দেহে এ গ্রন্থি থাকে না।

অন্যান্য লসিকাগ্রন্থির মতো অ্যাডেনয়েড অনাক্রম্যতন্ত্রের অংশ এবং লসিকা কলা (lymphoid tissue) দ্বারা গঠিত। অ্যাডেনয়েড রক্ত থেকে অণুজীব ছেঁকে অনেকটা টনসিলের মতো দেহকে সুস্থ রাখতে সহায়তা করে। অ্যাডেনয়েড অণুজীব দ্বারা আক্রান্ত হলে শিশুদের অ্যাডেনোডাইটস (adenoiditis) রোগ দেখা দেয় যাতে প্রচণ্ড প্রদাহ অনুভূত হয়। অ্যাডেনয়েড অণুজীব দ্বারা অতিমাত্রায় আক্রান্ত হয়ে ফুলে গেলে দেহ হতে অপসারণের প্রয়োজন হয়।

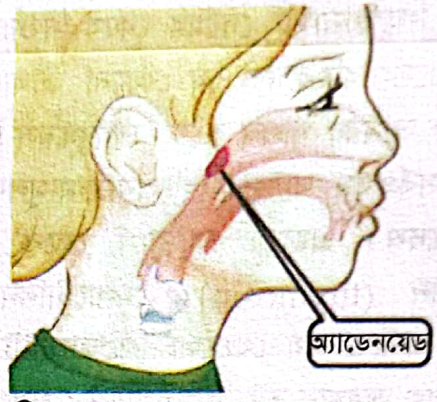

চিত্র ৪.১৬অ্যাডেনয়েডের অবস্থান

রক্ত ও লসিকার মধ্যে পার্থক্য

রক্ত	লসিকা
১। রক্ত লাল বর্ণের পরিবহন কলা।	১। লসিকা সাদা বর্ণের পরিবহন কলা।
২। রক্ত রক্তনালিতে সুনির্দিষ্ট চাপে প্রবাহিত হয়।	২। লসিকা লসিকানালিতে চাপহীন প্রবাহিত হয়।
৩। রক্ত প্লাজমা, লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা এবং অনুচক্রিকা নিয়ে গঠিত।	৩। লসিকা প্লাজমা ও শ্বেত রক্তকণিকা নিয়ে গঠিত।
৪। রক্তে হিমোগ্লোবিন বিদ্যমান।	৪। লসিকাতে হিমোগ্লোবিন থাকে না।
৫। রক্ত অধিক পরিমাণ প্রোটিন, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসযুক্ত।	৫। লসিকা অল্প পরিমাণ প্রোটিন, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসযুক্ত।
৬। রক্তের মাধ্যমে শ্বসন গ্যাস ও খাদ্যকণা (শর্করা ও আমিষ) পরিবাহিত হয়।	৬। লসিকার মাধ্যমে বর্জ্য পদার্থ ও খাদ্যসার (লিপিড) পরিবাহিত হয়।

প্লাজমা (রক্তরস) ও লসিকার মধ্যে পার্থক্য

প্লাজমা (রক্তরস)	লসিকা
১। এটি রক্তের কোষবিহীন তরল যাতে খনিজ লবণের আয়ন, দ্রবীভূত প্রোটিন ও জীবনের প্রয়োজনীয় অন্যান্য সব উপাদান বিদ্যমান থাকে।	১। লসিকা সাদা বর্ণের তরল যাতে শ্বেত রক্তকণিকা, খনিজ লবণের আয়ন, সামান্য প্রোটিন, বর্জ্য পদার্থ ও লিপিড কণা থাকে।
২। রক্ত বাহিকার মাধ্যমে প্রবাহিত হয়।	২। লসিকা নালিকার মাধ্যমে প্রবাহিত হয়।
৩। জমাট বাধতে পারে।	৩। জমাট বাধতে পারে না।
৪। বিভিন্ন বস্তু পরিবহনের মাধ্যমে পুষ্টি, রেচন ও শ্বসন কাজে এবং অ্যান্টিবডি উৎপাদনের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা কাজে অংশগ্রহণ করে।	৪। দেহের যেসব কলায় রক্ত পৌছাতে অক্ষম লসিকা সেসব কলায় পুষ্টি ও অক্সিজেন সরবরাহ করে, চর্বি শোষণ করে এবং দেহের প্রতিরক্ষা কাজে অংশগ্রহণ করে।

CamScanner

৪.৩ মানব হৃৎপিণ্ড (Human Heart)

মানুষের রক্ত সংবহনতন্ত্রের কেন্দ্রীয় পাম্প যন্ত্র হলো হৃৎপিণ্ড। এটি সর্বদা একটি ছন্দোময় সঙ্কোচন-প্রসারণ ক্রিয়ার মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে ফিরে আসা রক্ত গ্রহণ করে এবং পুনরায় সমগ্র দেহে রক্ত প্রেরণ করে।

১। অবস্থান (Position): বক্ষ গহ্বরের মধ্য মিডিয়াস্টিনাম অঞ্চলের কিঞ্চিৎ বাম দিকে, বক্ষ কশেরুকা T5-T8 বরাবর ডায়াফ্রামের উপরে দুই ফুসফুসের মধ্যস্থলে হৃৎপিণ্ডটি সামান্য বাম দিকে হেলানো অবস্থায় অবস্থিত।

২। আকার ও আকৃতি (Shape and Size): লালচে-খয়েরী বর্ণের হৃৎপিণ্ড ত্রিকোণাকৃতির মোচার মতো। এর চওড়া ঊর্ধ্বমুখী অংশকে বেস (base) এবং ক্রমশ সরু নিম্নমুখী অংশকে এপেক্স (apex) বলে। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের হৃৎপিণ্ডের দৈর্ঘ্য 12 সেন্টিমিটার এবং প্রস্থ 9 সেন্টিমিটার। এর ওজন প্রায় 250 -350 গ্রাম।

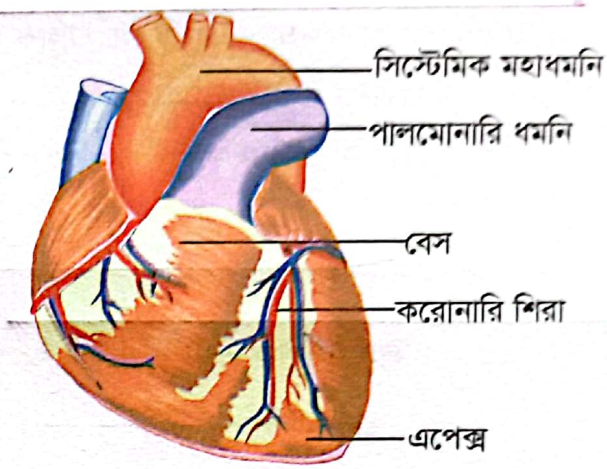

চিত্র ৪.১৫ মানুষের হৃৎপিণ্ডের বাহ্যিক গঠন

৩। আবরণ (Covering): হৃৎপিণ্ডটি মসৃণ, পাতলা ও দ্বিস্তরী একটি আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে। একে পেরিকার্ডিয়াম (pericardium) বলে। পেরিকার্ডিয়ামের বাইরের স্তরকে প্যারাইটাল স্তর (parietal layer) এবং ভেতরের স্তরকে ভিসেরাল স্তর (visceral layer) বলে।

প্যারাইটাল স্তরটি হৃৎপিণ্ডকে অতিরিক্ত প্রসারিত হতে বাধা দেয়। এ দুই স্তরের মাঝে পেরিকার্ডিয়াল তরল (pericardial fluid) থাকে যা হৃৎপিণ্ডকে তাপ, চাপ ও ঘর্ষণের আঘাত হতে রক্ষা করে।

৪। প্রাচীর (Wall): হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর অনৈচ্ছিক পেশি ও যোজক কলা দ্বারা গঠিত। এর প্রাচীর গঠনকারী পেশিকে কার্ডিয়াক পেশি (cardiac muscles) বলে। পেশি ও যোজক কলা তিনটি স্তরে বিন্যস্ত থেকে হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর গঠন করে। স্তর তিনটি হলো-

(ক) এপিকার্ডিয়াম (Epicardium): এটি পাতলা ও স্বচ্ছ যোজক কলা নির্মিত হৃৎপ্রাচীরের সর্ববহিঃস্থ স্তর। এ স্তরে বিক্ষিপ্তভাবে চর্বি লেগে থাকে।

(খ) মায়োকার্ডিয়াম (Myocardium): এটি কার্ডিয়াক পেশি নির্মিত হৃৎপ্রাচীরের মধ্যবর্তী স্তর। কার্ডিয়াক পেশি দৃঢ় প্রকৃতির এবং এগুলো হৃৎপিণ্ড সঙ্কোচন-প্রসারণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

(গ) এন্ডোকার্ডিয়াম (Endocardium): এটি যোজক কলা নির্মিত হৃৎপ্রাচীরের অন্তঃস্থ স্তর। এটি হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠের অন্তঃপ্রাচীর গঠন করে, হৃৎকপাটিকাসমূহ ঢেকে রাখে এবং রক্তবাহিকার সাথে হৃৎপিণ্ডের অবিচ্ছিন্ন সংযোগ ঘটায়।

৫। প্রকোষ্ঠ (Chambers): মানুষের হৃৎপিণ্ড চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট। এদের দুটি উপরে এবং দুটি নিচের দিকে অবস্থিত। উপরের প্রকোষ্ঠ দুটিকে বাম ও ডান অলিন্দ (left and right auricle) এবং নিচের প্রকোষ্ঠ দুটিকে বাম ও ডান নিলয় (left and right ventricle) বলে। হৃৎপিণ্ডের এ বিভাজন বাইরের দিক থেকে করোনারি সালকাস (coronary sulcus) নামক খাঁজের মাধ্যমে দৃশ্যমান হয়।

(ক) অলিন্দ (Auricle): পাতলা প্রাচীর বিশিষ্ট অলিন্দ আন্তঃঅলিন্দ পর্দা দ্বারা ডান ও বাম অংশে পৃথক থাকে। বাম অলিন্দ চারটি পালমোনারি শিরা থেকে অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত গ্রহণ করে যেগুলো অলিন্দের উপরের দিকে কপাটিকা বিহীন ছিদ্রের মাধ্যমে উন্মুক্ত হয়। বাম অলিন্দ একটি বাম অলিন্দ-নিলয় ছিদ্র (left atrio-ventricular orifice) দ্বারা বাম নিলয়ে উন্মুক্ত হয়। ডান অলিন্দ উপরের দিকে একটি ঊর্ধ্ব মহাশিরা বা সুপেরিয়র ভেনাক্যাভা (superior vena cava), নিচের দিকে একটি নিম্ন মহাশিরা বা ইনফেরিয়র ভ্যানাক্যাভা (inferior vena cava) এবং মাঝের

CamScanner

দিকে একটি করোনারি সাইনাস (coronary sinus) থেকে অক্সিজেনরিক্ত রক্ত গ্রহণ করে। ডান অলিন্দ একটি ডান অলিন্দ-নিলয় ছিদ্র (left atrio-ventricular orifice) দ্বারা ডান নিলয়ে উন্মুক্ত হয়।

(খ) নিলয় (Ventricle): হৃৎপিণ্ডের নিচের দিকে একটি আন্তঃনিলয় প্রাচীর দ্বারা বাম ও ডান নিলয় পরস্পর হতে পৃথক থাকে। এদের প্রাচীর অলিন্দের প্রাচীর অপেক্ষা পুরু ও মাংসল। বাম নিলয়ের প্রাচীর ডান নিলয়ের প্রাচীর অপেক্ষা প্রায় তিনগুণ পুরু। নিলয় প্রাচীরের অন্তর্গাত্র হতে কতগুলো মাংসল পেশি নিলয় প্রকোষ্ঠে অভিক্ষেপিত অবস্থায় থাকে। এদের কলামনি কর্নি (columnae cornae) বলে। ডান নিলয়ের সম্মুখভাগে একটি পালমোনারি মহাধমনি এবং বাম নিলয়ের সম্মুখভাগে একটি সিস্টেমিক মহাধমনি যুক্ত থাকে।

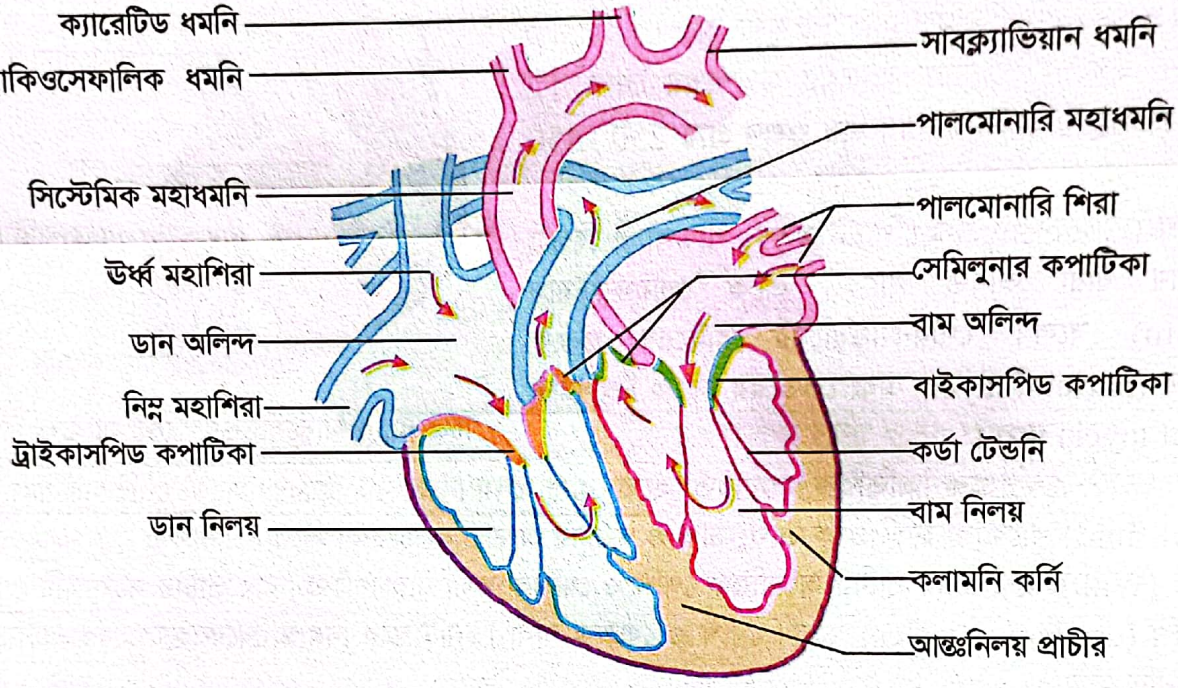

চিত্র ৪.১৭ মানব হৃৎপিণ্ডের লম্বচ্ছেদ (সরলচিত্র) তীর চিহ্ন দ্বারা রক্তের গতিপথ দেখানো হয়েছে

হৃৎপিণ্ডের বাম নিলয়ের প্রাচীর ডান নিলয়ের প্রাচীর অপেক্ষা পুরু কেন?

হৃৎপিণ্ডের ডান নিলয় থেকে রক্ত ফুসফুসে রক্ত প্রেরিত হয়। এটি হৃৎপিণ্ডের খুব নিকটে অবস্থিত বলে খুব কম শক্তি প্রয়োগ করে রক্ত পাঠানো যায়। অন্যদিকে হৃৎপিণ্ডের বাম নিলয় থেকে সমগ্র দেহে রক্ত প্রেরিত হয় যাতে অনেক বেশি শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। ফলে সম পরিমাণ রক্ত প্রেরণ করলেও ডান নিলয় থেকে বাম নিলয়ের বেশি কাজ করতে হয়। এ কর্মদক্ষতার তারতম্যের কারণে বাম নিলয়ের প্রাচীরের অঙ্গসংস্থানিক পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ বাম নিলয়ের প্রাচীর ডান নিলয়ের প্রাচীর অপেক্ষা অধিক পুরু হয়।

৬। হৃৎকপাটিকা (Cardiac valves): মানব হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন ছিদ্রপথ ভাল্ব বা কপাটিকা দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরের এন্ডোকার্ডিয়াম স্তর ভাঁজ হয়ে এসব কপাটিকা গঠন করে। হৃৎপিণ্ডের সকল কপাটিকা একমুখী রক্তপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। মানব হৃৎপিণ্ডে নিম্নের চার ধরনের কপাটিকা পাওয়া যায়:

(ক) বাইকাসপিড বা মিট্রাল কপাটিকা (Bicuspid or mitral valve): হৃৎপিণ্ডের বাম অলিন্দ ও বাম নিলয়ের মধ্যে সংযুক্ত ছিদ্রপথ দ্বি-পর্দা (dual-flap) সমন্বিত একটি বাইকাসপিড কপাটিকা বা মিট্রাল কপাটিকা দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। পরিণত মানুষের মিট্রাল কপাটিকার আয়তন 4–6 বর্গসেন্টিমিটার। এ কপাটিকা কর্ডা টেন্ডনি (chordae tendineae) নামক তন্তু দ্বারা নিলয়ের প্রাচীরের কলামনি কর্নির সাথে যুক্ত থাকে।

(খ) ট্রাইকাসপিড কপাটিকা (Tricuspid valve): হৃৎপিণ্ডের ডান অলিন্দ এবং ডান নিলয়ের মধ্যে সংযুক্ত ছিদ্রপথ ত্রি-পর্দা (tri-flap) সমন্বিত একটি ট্রাইকাসপিড কপাটিকা দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। পরিণত মানুষের

CamScanner

ট্রাইকাসপিড কপাটিকার আয়তন 7–9 বর্গ সেন্টিমিটার। এটিও কর্ডা টেন্ডনি তন্তু দ্বারা নিলয়ের প্রাচীরের কলামনি কর্নির সাথে যুক্ত থাকে।

(গ) অ্যাওর্টিক কপাটিকা (Aortic valves): বাম নিলয় ও সিস্টেমিক মহাধমনির মাঝের ছিদ্রপথ একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতির (semilunar) অ্যাওর্টিক কপাটিকা দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। অধিকাংশ মানুষের অ্যাওর্টিক কপাটিকা ত্রি-পর্দা (Tri-flap) বিশিষ্ট কিন্তু 1–2% মানুষের ক্ষেত্রে এটি দ্বি-পর্দা (dual-flap) বিশিষ্ট।

(ঘ) পালমোনারি কপাটিকা (Pulmonary valves): ডান নিলয় ও পালমোনারি ধমনির মাঝের ছিদ্রপথ একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতির ত্রি-পর্দা বিশিষ্ট পালমোনারি কপাটিকা (pulmonary valves) দ্বারা সুরক্ষিত থাকে।

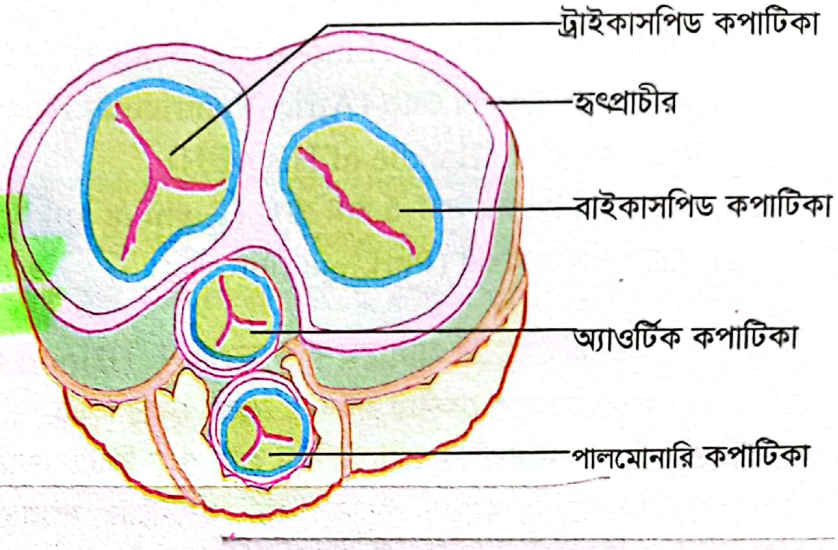

চিত্র ৪.১৮ হৃৎপিণ্ডের কপটিকাসমূহ (প্রস্থচ্ছেদে)

উপরোক্ত চার ধরনের কপাটিকা ছাড়াও হৃৎপিণ্ডের সাথে জড়িত আরো দুধরনের কপাটিকা থাকে, যেমন-

❑ ইউস্টেশিয়ান কপাটিকা (The Eustachian valves): নিম্ন মহাশিরা ও ডান অলিন্দের সংযোগস্থলে ইউস্টেশিয়ান কপাটিকা থাকে। তবে গর্ভকালীন সময় ব্যতিত এ কপাটিকার বিশেষ কোনো কাজ থাকে না। ইতালিয়ান চিকিৎসক বার্টোলোমিও ইউস্টেশি (Bartolomeo Eustachi) এ কপাটিকা আবিষ্কার করেন।

❑ থিবেসিয়ান কপাটিকা (The Thebesian valve): করোনারি সাইনাস ও ডান অলিন্দের সংযোগস্থলে অর্ধচন্দ্রাকৃতির থিবেসিয়ান কপাটিকা থাকে। এটি ভ্রূণীয় সাইনো-অ্যাট্রিয়াল কপাটিকার ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ, তবে অনেকক্ষেত্রে এ কপাটিকা সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত।

৭। হৃৎপেশি (Muscles of Heart): হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরের মায়োকার্ডিয়াল স্তর বিশেষ ধরনের অনৈচ্ছিক পেশি দ্বারা গঠিত। এদের কার্ডিয়াক পেশি বা হৃৎপেশি বলে। এদের কিছু বৈশিষ্ট্য কঙ্কালপেশি বা অন্যান্য পেশির মতো হলেও এরা নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য দ্বারা অন্যান্য পেশি হতে আলাদা-

- এদের স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দময় সঙ্কোচন-প্রসারণশীলতা সম্পূর্ণরূপে অনৈচ্ছিক।
- এদের তন্তুগুলো সরল চোঙ্গাকৃতির নয় বরং এগুলো দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পাশেরটির সাথে মিশে ত্রৈমাত্রিক নেটওয়ার্ক গঠন করে যা অপ্রকৃত সিনসাইসিয়ামের (syncycium) মতো দেখায়।
- এদের কোষের কেন্দ্রের দিকে একটি নিউক্লিয়াস থাকে।
- এদের কোষের সারকোপ্লাজমে সমান্তরালে সজ্জিত মায়োফাইব্রিল (myofibrils) নামক সূক্ষ্ম তন্তু থাকে।
- হৃৎপেশির দুটি কোষের সংযোগস্থলের সারকোলেমা মিলিত হয়ে ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক (intercalated disc) গঠন করে।
- হৃৎপেশি হৃৎপিণ্ডের প্রতিরক্ষাকারী স্তর গঠন করে।
- হৃৎপেশিতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন সরবরাহের প্রয়োজন হয় যার ব্যত্যয় ঘটলে নানাবিধ সমস্যা এমনকি পেশির মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে।
- হৃৎপেশির কোষগুলোতে (cardiomyocytes) মাইটোকন্ড্রিয়ার আধিক্যতা দেখা যায় যা কোষের অবিরাম অবাত শ্বসনের সুযোগ প্রদান করে।
- অধিকাংশ হৃৎপেশি হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত রক্তনালিতে প্রেরণের কাজে নিয়োজিত থাকে।

CamScanner

৮। **সংযোগকারী কলা** (Junctional tissues of heart): হৃৎপেশিতে কতগুলো প্রয়োজনীয় ও বিশেষ ধরনের গঠন থাকে যারা হৃৎস্পন্দন সৃষ্টি ও পরিবহন করে। এদেরকে হৃৎপিণ্ডের সংযোগকারী কলা বলে। এগুলো হলো:

(ক) সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড (Sino-Atrial Node = SAN)
(খ) অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার নোড (Atrio-Ventricular Node = AVN)
(গ) বান্ডল অব হিজ (Bandle of His =BH)
(ঘ) বান্ডল অব হিজের ডান ও বাম শাখা (Right & left branches of BH)
(ঙ) পারকিন্‌জি ফাইবার (Purkinje fibres)

হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে রক্ত সংবহন (Blood Circulation Through Heart)

হৃৎপিণ্ড রক্ত সংবহনতন্ত্রের কেন্দ্রীয় গ্রহণ ও প্রেরণ কেন্দ্র। এর পর্যায়ক্রমিক সঙ্কোচন-প্রসারণের ফলে রক্ত সমগ্র দেহে পরিবাহিত হয়। মানব হৃৎপিণ্ড প্রতি মিনিটে প্রায় 5-7 লিটার এবং প্রতিদিন প্রায় 7600 লিটার রক্ত পাম্প করে এবং প্রায় 100,000 বার সঙ্কোচিত-প্রসারিত হয়। হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচনকে **সিস্টোল** এবং প্রসারণকে **ডায়াস্টোল** বলে। হৃৎপিণ্ডের সকল অংশ একসাথে সঙ্কোচিত বা প্রসারিত হয় না। এর অলিন্দদ্বয় সঙ্কোচনের সময় নিলয়দ্বয় প্রসারিত হয় এবং নিলয়দ্বয় সঙ্কোচনের সময় অলিন্দদ্বয় প্রসারিত হয়। এভাবে একটি ছন্দোময় পদ্ধতিতে হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে সমগ্র দেহে রক্ত পরিচালিত হয়। মানুষের হৃৎপিণ্ডে দ্বি-বর্তনী সংবহন (double circuit circulation) ঘটে। **যে রক্ত সংবহনতন্ত্রে রক্ত সমগ্র দেহে একবার পরিপূর্ণ চক্র সম্পন্ন করার পূর্বে হৃৎপিণ্ড দিয়ে দুবার প্রবাহিত হয় তাকে দ্বি-বর্তনী সংবহন তন্ত্র বলে।** মানুষসহ সকল স্তন্যপায়ী এবং সকল পাখিদের দেহে এ ধরনের রক্ত সংবহন থাকে। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ধাপগুলো পরিলক্ষিত হয়-

১। একটি সুপিরিয়র ও একটি ইনফিরিয়র ভেনাকেভার (ঊর্ধ্ব ও নিম্ন মহাশিরা) মাধ্যমে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত ডান অলিন্দে প্রবেশ করে এবং একই সময়ে দুটি পালমোনারি শিরার মাধ্যমে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত বাম অলিন্দে প্রবেশ করে।

২। অলিন্দদ্বয়ের যুগপৎ সঙ্কোচনের ফলে এর অভ্যন্তরে রক্তচাপ বেড়ে যায়। ফলে অলিন্দ-নিলয় ছিদ্রে বিদ্যমান কপাটিকাসমূহ (ট্রাইকাসপিড ও মিট্রাল কপাটিকা) খুলে গিয়ে অলিন্দ-নিলয় ছিদ্র পথে ডান অলিন্দ থেকে রক্ত ডান নিলয়ে এবং একই সাথে বাম অলিন্দ থেকে রক্ত বাম নিলয়ে প্রবেশ করে।

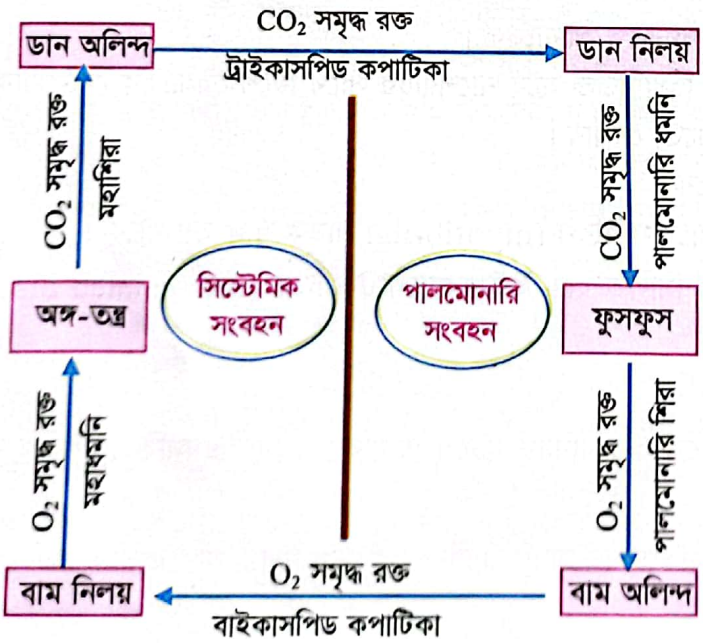

চিত্র ৪.১৯ মানব হৃৎপিণ্ডের দ্বি-বর্তনী সংবহন

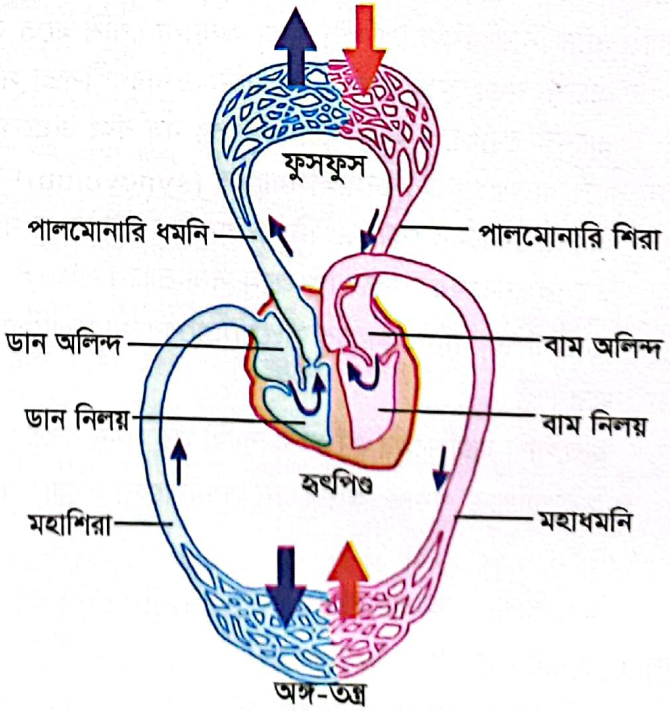

চিত্র ৪২০ মানব হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে রক্তপ্রবাহ

CamScanner

৩। নিলয়দ্বয় রক্ত দ্বারা পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে এদের সঙ্কোচন ক্রিয়া শুরু হয়। এসময় ট্রাইকাসপিড ও মিট্রাল কপাটিকা বন্ধ হয়ে যায়। ডান নিলয় থেকে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত পালমোনারি কপাটিকার মাধ্যমে পালমোনারি ধমনিতে এবং বাম নিলয় থেকে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত অ্যাওর্টিক কপাটিকার মাধ্যমে সিস্টেমিক অ্যাওর্টাতে (মহাধমনি) প্রবেশ করে।

৪। পালমোনারি ধমনির CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত ফুসফুসে গিয়ে পরিশোধিত হয়ে O_2 সমৃদ্ধ হয় এবং পালমোনারি শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের বাম অলিন্দে ফিরে আসে।

৫। সিস্টেমিক অ্যাওর্টা থেকে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন কলা ও তন্ত্রের কৈশিক জালিকাতে প্রবেশ করে এবং O_2 বিমুক্ত করে CO_2 সমৃদ্ধ হয় এবং বিভিন্ন শিরার মাধ্যমে পরিশেষে দুটি ভেনাক্যাভা দ্বারা হৃৎপিণ্ডের ডান অলিন্দে ফিরে আসে। হৃৎপিণ্ডের ক্রম সঙ্কোচন-প্রসারণের মাধ্যমে এ প্রক্রিয়া বিরামহীনভাবে চলতে থাকে।

একবর্তনী সংবহন ও দ্বি-বর্তনী সংবহন-এর মধ্যে পার্থক্য

একবর্তনী সংবহন	দ্বি-বর্তনী সংবহন
১। একবর্তনী সংবহনে রক্ত দেহে একটি চক্র সম্পন্ন করার সময় মাত্র একবার হৃৎপিণ্ড অতিক্রম করে।	১। দ্বি-বর্তনী সংবহনে রক্ত দেহে একটি চক্র সম্পন্ন করার সময় দুইবার হৃৎপিণ্ড অতিক্রম করে।
২। দুই প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে এ চক্র সংঘটিত হয়।	২। চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে এ চক্র সংঘটিত হয়।
৩। মাছ জাতীয় মেরুদণ্ডী প্রাণীতে একবর্তনী সংবহন সংঘটিত হয়।	৩। পাখি ও স্তন্যপায়ী জাতীয় মেরুদণ্ডী প্রাণীতে একবর্তনী সংবহন সংঘটিত হয়।
৪। হৃৎপিণ্ডে কেবল ভেনাস বা অক্সিজেনরিক্ত রক্ত প্রবাহিত হয়।	৪। হৃৎপিণ্ডে ভেনাস বা অক্সিজেনরিক্ত এবং আর্টারিয়াল বা অক্সিজেনসমৃদ্ধ উভয় রক্ত প্রবাহিত হয়।
৫। একবর্তনী সংবহন কম দক্ষতায় অক্সিজেন সরবরাহ করে।	৫। দ্বি-বর্তনী সংবহন অধিক দক্ষতায় অক্সিজেন সরবরাহ করে।
৬। একবর্তনী সংবহনে নিম্ন চাপে রক্ত প্রবাহিত হয়।	৬। দ্বি-বর্তনী সংবহনে উচ্চ চাপে রক্ত প্রবাহিত হয়।
৭। এক্ষেত্রে কোষে অক্সিজেন সরবরাহের হার কম।	৭। এক্ষেত্রে কোষে অক্সিজেন সরবরাহের হার বেশি।

রক্তবাহিকা (Blood Vessels)

যেসব নালিকার মাধ্যমে রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের বিভিন্ন তন্ত্র, অঙ্গ, কলা ও কোষে বাহিত হয় এবং দেহের ঐসব স্থান হতে রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে তাদের রক্তবাহিকা বলে। তিন ধরনের রক্তবাহিকা দ্বারা রক্ত পরিবাহিত হয়, যথা-

(ক) ধমনী (Artery) (খ) শিরা (Vein) ও (গ) কৈশিকনালিকা (Capillaries)

(ক) ধমনী (Artery): যেসব রক্ত নালিকার মাধ্যমে রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের বিভিন্ন অংশে প্রেরিত হয় তাদের ধমনী বলে। ধমনীর প্রাচীর বেশ পুরু, মজবুত ও স্থিতিস্থাপক। এর প্রাচীর তিনটি স্তর নিয়ে গঠিত। বাইরের স্তরটি যোজক কলা নির্মিত, একে টিউনিকা এক্সটার্না বা টিউনিকা এডভানটিশিয়া (tunica externa or tunica adventitia) বলে। মাঝের স্তরটি পেশিকলা নির্মিত, একে টিউনিকা মিডিয়া (tunica media) বলে। ভিতরের স্তরটি এন্ডোথেলিয়াম কলা নির্মিত, একে টিউনিকা ইন্টিমা (Tunica intima) বলে। ধমনীর কেন্দ্রের ছিদ্র বা লুমেন (lumen) ছোট। এতে কোনো কপাটিকা থাকে না। ধমনী দিয়ে উচ্চচাপে রক্ত প্রবাহিত হয়। হৃৎপিণ্ড থেকে উৎপন্ন হয়ে ধমনী দেহের বিভিন্ন অংশে শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে কৈশিকনালিকাতে পরিসমাপ্তি ঘটায়।

(খ) শিরা (Vein): যেসব রক্তনালিকার মাধ্যমে রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে তাদের শিরা বলে। শিরার প্রাচীর ধমনীর মতো তিনস্তর বিশিষ্ট হলেও এটি পাতলা, পেশিবিহীন ও কম স্থিতিস্থাপক। এদের লুমেন

CamScanner

বেশ বড় এবং অর্ধ চন্দ্রাকৃতির কপাটিকাযুক্ত। শিরার মধ্য দিয়ে নিম্নচাপে রক্ত প্রবাহিত হয়। সকল শিরাই কৈশিকনালিকা থেকে সৃষ্টি হয়ে হৃৎপিণ্ডে শেষ হয়।

(গ) কৈশিকনালিকা (Capillaries): কোষ-কলার ফাঁকে ফাঁকে অবস্থিত, জালিকার ন্যায় বিস্তৃত, সূক্ষ্ম প্রাচীর বিশিষ্ট, অতি সরু আণুবীক্ষণিক রক্তনালিকাকে কৈশিকনালিকা বলে। ধমনী বিশ্লিষ্ট হয়ে কৈশিকনালিকা গঠন করে। এদের ব্যাস সাধারণত 10 মাইক্রনের চেয়ে কম। এদের প্রাচীর একস্তরী এন্ডোথেলিয়াম দ্বারা গঠিত। এদের প্রাচীর সূক্ষ্ম হওয়াতে রক্ত ও কলারসের মধ্যে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় খাদ্যসার, রেচন বর্জ্য, শ্বসন গ্যাস ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বিনিময় ঘটে।

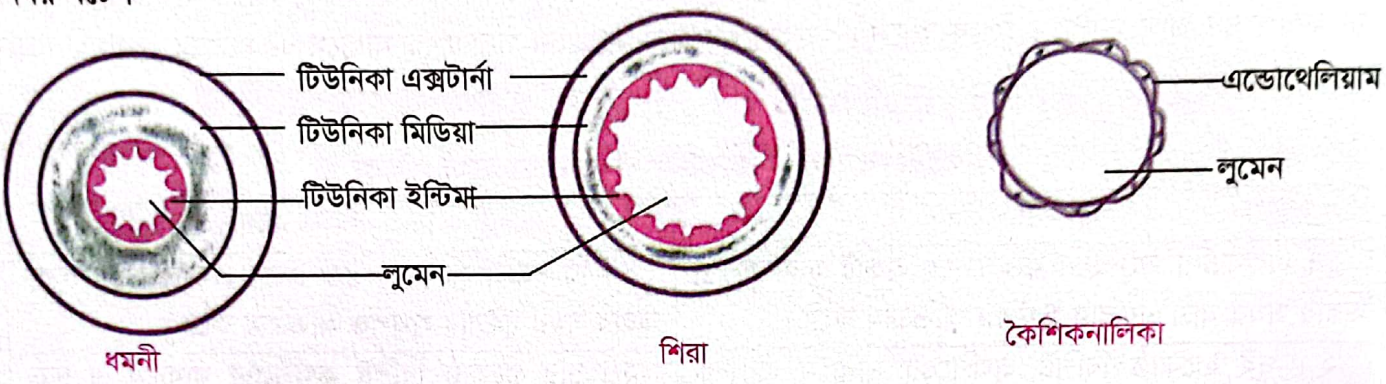

চিত্র: ৪.২১ ধমনী, শিরা ও কৈশিকনালিকার প্রস্থচ্ছেদ

শিরা ও ধমনীর মধ্যে পার্থক্য

বৈশিষ্ট্য	ধমনী	শিরা
১। প্রকৃতি	১। হৃৎপিণ্ড হতে সৃষ্টি হয়ে দেহের বিভিন্ন অংশে বিস্তৃত কৈশিকনালিকায় সমাপ্ত হয়।	১। দেহের বিভিন্ন অংশের কৈশিকনালিকা হতে সৃষ্টি হয়ে হৃৎপিণ্ডে এসে সমাপ্ত হয়।
২। প্রাচীর	২। বেশ পুরু ও স্থিতিস্থাপক।	২। কম পুরু ও অস্থিতিস্থাপক।
৩। লুমেন	৩। সরু ও কপাটিকা বিহীন।	৩। প্রশস্ত ও কপাটিকাযুক্ত।
৪। রক্তের ধরণ	৪। পালমোনারি ধমনী ব্যতিত সকলেই O_2 সমৃদ্ধ রক্ত বহন করে।	৪। পালমোনারি শিরা ব্যতিত সকলেই CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত বহন করে।
৫। রক্তচাপ	৫। উচ্চচাপে রক্ত প্রবাহিত হয়।	৫। নিম্নচাপে রক্ত প্রবাহিত হয়।

৪.৫ হৃৎচক্র (Cardiac cycle) বা হার্টবিটের দশাসমূহ

হৃৎপিণ্ডের পর্যায়ক্রমিক সঙ্কোচন ও প্রসারণকে হৃৎস্পন্দন (heart beat) বলে। হৃৎপিণ্ডের প্রতিটি স্পন্দনে কতগুলো ধারাবাহিক ঘটনা সংঘটিত হয়। একটি হৃৎপন্দন সম্পন্ন করতে হৃৎপিণ্ডে সংঘটিত ঘটনার সমষ্টিকে হৃৎচক্র (cardiac cycle) বলে। গর্ভধারণের চার সপ্তাহ পর থেকে হৃৎস্পন্দন শুরু হয় এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এটি অবিরাম চলতে থাকে। একজন সুস্থ মানুষের হৃৎস্পন্দন প্রতি মিনিটে 72-75 বার। সে হিসেবে একটি হৃৎচক্রের স্থিতিকাল 0.8 সেকেন্ড। প্রতি হৃৎস্পন্দনে হৃৎপিণ্ড 60 -70 মিলিলিটার রক্ত পাম্প করে। মানুষের হৃৎপিণ্ডে হৃৎচক্র চারটি ধাপে সংঘটিত হয়। ধাপগুলো হলো-

১। অলিন্দের ডায়াস্টোল (Atrial diastole): ডান ও বাম অলিন্দ একইসাথে প্রসারিত হয়। এসময় ট্রাইকাসপিড ও বাইকাসপিড কপাটিকা বন্ধ থাকে এবং উর্ধ্ব ও নিম্ন মহাশিরার মাধ্যমে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত ডান অলিন্দে এবং পালমোনারি শিরার মাধ্যমে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত বাম অলিন্দে প্রবেশ করে। 0.7 সেকেন্ডে অলিন্দদ্বয় রক্ত দ্বারা পূর্ণ হয় এবং তাৎক্ষণিকভাবে অলিন্দের সিস্টোল শুরু হয়।

২। অলিন্দের সিস্টোল (Atrial systole): এর শুরুতে ট্রাইকাসপিড ও বাইকাসপিড কপাটিকা খুলে যায়। ডান ও বাম অলিন্দ একত্রে দ্রুত সঙ্কোচিত হয় এবং এতে রক্ত নিলয়ে প্রবেশ করে। এ ধাপে সময় লাগে মাত্র 0.1 সেকেন্ড।

CamScanner

৩। নিলয়ের সিস্টোল (Ventricular systole): অলিন্দের সিস্টোলের সময় নিলয়দ্বয় রক্তপূর্ণ হয় এবং সাথে সাথেই নিলয়দ্বয়ের সঙ্কোচন ঘটে। এতে নিলয়ের অভ্যন্তরে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। এসময় বাইকাসপিড ও ট্রাইকাসপিড কপাটিকা বন্ধ হয়ে যায় এবং পালমোনারি ও সিস্টেমিক ধমনির গোড়ায় অবস্থিত সেমিলুনার কপাটিকা খুলে গিয়ে রক্ত ধমনিদ্বয়ে প্রবেশ করে। এ ধাপে সময় লাগে 0.3 সেকেন্ড।

৪। নিলয়ের ডায়াস্টোল (Ventricular diastole): নিলয়ের সিস্টোল শেষ হওয়ার সাথে সাথে এর ডায়াস্টোল শুরু হয়। এ সময় বাইকাসপিড ও ট্রাইকাসপিড কপাটিকা খুলে অলিন্দ থেকে রক্ত নিলয়ে প্রবেশ করে। একই সাথে সেমিলুনার কপাটিকাগুলো সজোড়ে বন্ধ হয়ে ধমনি থেকে রক্তের পশ্চাৎমুখী রক্তপ্রবাহ রোধ করে। এ ধাপে সময় লাগে 0.5 সেকেন্ড। নিলয়ের সিস্টোলের সময় বাইকাসপিড ও ট্রাইকাসপিড কপাটিকা সজোড়ে বন্ধ হয়ে যাওয়ার সময় যে শব্দের সৃষ্টি হয় তাকে লাব (lub) এবং নিলয়ের ডায়াস্টোলের সময় সেমিলুনার কপাটিকাসমূহ বন্ধ হওয়ার সময় যে শব্দের সৃষ্টি হয় তাকে ডাব (dub) বলে। একটি সিস্টোল ও একটি ডায়াস্টোল-এর সমন্বয়ে প্রতি 0.8 (0.7 +0.1 or 0.3 +0.5) সেকেন্ডে একটি হৃৎপন্দন বা কার্ডিয়াক চক্র সম্পন্ন হয়। হৃৎপন্দনের সময় যে শব্দ শুনা যায় তাকে লাব-ডাব (lub-dub) বলে। প্রতি মিনিটে মানব হৃৎস্পন্দন ঘটে 72 বার যা সারাদিনে 100,000 বার, বছরে 3,600,000 বার এবং 70 বছর বয়স্ক একজন মানুষের সারাজীবনে 2.5 বিলিয়ন বার।

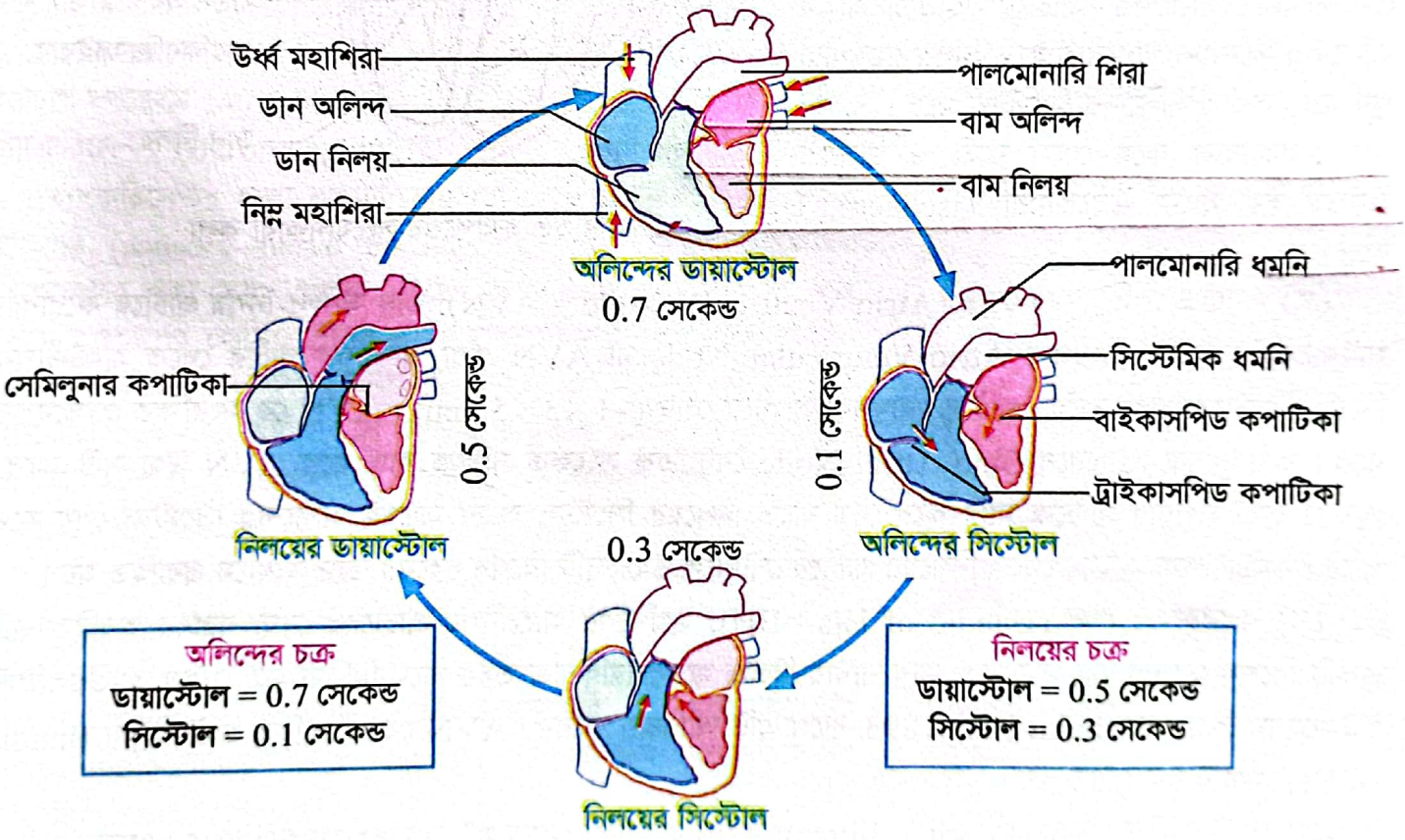

চিত্র ৪.২২ কার্ডিয়াক চক্রের বিভিন্ন ধাপে হৃৎপিণ্ডের অবস্থা

হার্টবিট নিয়ন্ত্রণে SA নোড, AV নোড এবং পারকিনজি আঁশের (Purkinji fibers) ভূমিকা

মানুষসহ সকল স্তন্যপায়ী প্রাণীর হৃৎপিণ্ড উন্নত ধরনের। এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সঙ্কোচিত-প্রসারিত হয়ে সমগ্র দেহে রক্ত পরিচালনা করে। মানবদেহে প্রতি মিনিটে গড়ে 72-75 বার হৃৎচক্র সম্পন্ন হয়। এতে প্রচণ্ড গতিতে দেহে রক্ত প্রবাহিত হয়। বাইরের কোনো উদ্দীপনা ছাড়াই হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। এ ধরনের নিয়ন্ত্রণকে মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ (myogenic control) বলে। হৃৎপিণ্ডে বিদ্যমান বিশেষ চার ধরনের সংযোগী কলা দ্বারা হৃৎস্পন্দন নিয়ন্ত্রিত হয়। এগুলো হলো:

CamScanner

(ক) সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড (Sino-Atrial Node = SAN): ডান অলিন্দের প্রাচীরে উর্ধ্ব মহাশিরার প্রবেশ পথের পাশে অবস্থিত সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোডকে প্রাকৃতিক পেসমেকার (natural pacemaker) বলা হয়, কারণ এখান থেকে সৃষ্ট অ্যাকশন পটেনশিয়াল (action potential) বা বৈদ্যুতিক সংকেত (electrical signal) বা হৃৎউদ্দীপনা অলিন্দের প্রাচীরে ছড়িয়ে গিয়ে অলিন্দের সঙ্কোচন ঘটায়।

মার্টিন ফ্লাক (Martin Flack), 1907 সালে এটি আবিষ্কার করেন। SAN একটি কলা আকৃতির (banana-shaped) গঠন। একটি সুস্থ হৃৎপিণ্ডে এর দৈর্ঘ্য 10–30 mm, প্রস্থ 5–7 mm এবং পুরুত্ব 1–2 mm। ঘড়ির মতো প্রতি সেকেন্ডে SAN একবার সঙ্কোচিত হয়। দেহ হতে হৃৎপিণ্ড বিচ্ছিন্ন করা হলেও এ সঙ্কোচন চলতে থাকে। এ কারণেই প্রতিস্থাপনের সময়ও হৃৎপিণ্ড সচল থাকে। SAN থেকে পাঠানো হৃৎউদ্দীপনা অলিন্দের প্রাচীরে ছড়িয়ে গিয়ে অলিন্দের সঙ্কোচন ঘটানোর ফলে নিলয় রক্ত দ্বারা পূর্ণ হয়, অর্থাৎ অলিন্দের সিস্টোল ঘটে। SAN এর কার্যকারিতা কমে গেলে ক্লান্তি ও শ্বাসকষ্ট অনুভব হয় যাকে ইশকেমিয়া (ischaemia) বলে।

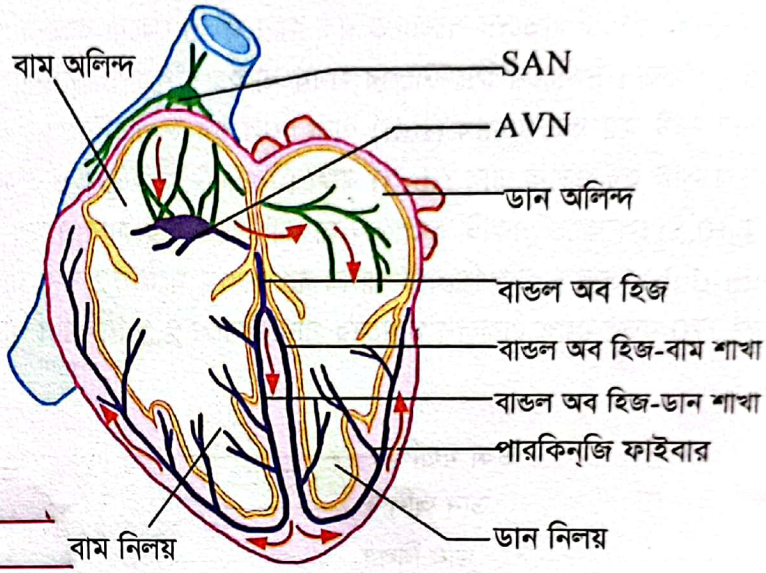

চিত্র ৪.২৩ হৃৎপিণ্ডের সংযোগকারী কলা

(খ) অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার নোড (Atrio-Ventricular Node = AVN): ডান অলিন্দ-নিলয় প্রাচীরে করোনারি সাইনাসের নিকটে বিদ্যমান Atrio-Ventricular Node বা AVN কলা অলিন্দের প্রাচীর থেকে হৃৎউদ্দীপনা নিলয়ের প্রাচীরে প্রেরণ করে। এটি তুলনামূলক আকারে ছোট (~1×3×5 mm)। AVN-কে সংরক্ষিত পেসমেকার বলে। কারণ কোনো কারণে Sino-Atrial Node বৈদ্যুতিক সংকেত সৃষ্টিতে ব্যর্থ হলে AVN উহা সৃষ্টি করে। AVN হৃৎউদ্দীপনার গতিকে মন্থর করে দেয় যাতে নিলয়ের সিস্টোল শুরুর আগেই অলিন্দের সিস্টোল শেষ হতে পারে। হৃৎউদ্দীপনা AVN থেকে নিলয়ের প্রাচীরে পৌছালে উহা দুটি বিশেষ ধরনের তন্তুর মাধ্যমে প্রবাহিত হয়।

(গ) বান্ডল অব হিজ (Bandle of His =BH): হৃৎপিণ্ডের আন্তঃনিলয় প্রাচীরের দৈর্ঘ্য বরাবর অবস্থিত এটি একটি বিশেষ ধরনের তন্তু যা বাম ও ডান শাখায় বিভক্ত হয়ে পারকিনজি তন্তুর সাথে মিলিত হয়। সুইস কার্ডিওলজিস্ট উইলহেলম হিজ (Wilhelm His) 1893 সালে এটি আবিষ্কার করেন। AVN থেকে প্রেরিত হৃৎউদ্দীপনা Bandle of His কলা কর্তৃক গৃহীত হয়।

(ঘ) পারকিন্‌জি ফাইবার (Purkinje fibres): বান্ডল অব হিজ থেকে সৃষ্ট এ তন্তুগুলো হৃৎপিণ্ডের নিলয়ের প্রাচীরে জালিকার মতো বিস্তৃত থাকে। জেন ইভানজেলিস্টা পারকিন্‌জি (Jan Evangelista Purkyne) 1839 সালে এটি আবিষ্কার করেন। বান্ডল অব হিজ-এর ডান ও বাম শাখা বরাবর প্রবাহিত হৃৎউদ্দীপনা পারকিন্‌জি ফাইবার-এর মাধ্যমে নিলয়ের প্রাচীরে সঞ্চারিত হয়। এতে রক্তপূর্ণ নিলয়ের সঙ্কোচন ঘটে। এ ঘটনাকে নিলয়ের সিস্টোল বলে। পারকিন্‌জি ফাইবারের মাধ্যমে হৃৎউদ্দীপনা সবচেয়ে দ্রুত ও কার্যকরিভাবে সঞ্চারিত হয়। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণের গতিপথ হলো:

সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড ⇨ অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার নোড ⇨ বান্ডল অব হিজ ⇨ পারকিন্‌জি ফাইবার

CamScanner

৪.৬ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ব্যারোরিসেপ্টরের ভূমিকা

রক্তচাপ (Blood pressure)

হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবাহিত হওয়ার সময় প্রবহমান রক্ত রক্তবাহিকার প্রাচীরে যে পার্শ্বীয় চাপ প্রয়োগ করে তাকে রক্তচাপ বা ব্লাড প্রেসার বলে। হৃৎপিণ্ডের কাছাকাছি ধমনিতে রক্তচাপ সবচেয়ে বেশি এবং এ চাপ দূরবর্তী ধমনিতে ক্রমশ কমে যায়। শিরায় রক্তচাপ খুবই কম। দেহে রক্তের পরিমাণ, হৃৎপিণ্ড থেকে নিষ্কৃত রক্তের পরিমাণ, রক্তের সান্দ্রতা এবং ধমনির স্থিতিস্থাপকতা রক্তচাপকে প্রভাবিত করে। স্ফিগমোম্যানোমিটার (sphygmomanometer) নামক যন্ত্র দ্বারা মানুষের রক্তচাপ পরিমাপ করা হয়। রক্তচাপ দুই ধরনের, যথা-

- **সিস্টোলিক চাপ (Systolic pressure):** হৃৎপিণ্ডের নিলয় সঙ্কোচিত থাকা অবস্থায় প্রবহমান রক্ত ধমনির প্রাচীরে যে উচ্চমাত্রার চাপ প্রয়োগ করে তাকে সিস্টোলিক চাপ বলে। প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মানুষের এ রক্তচাপ 110-140 মি.মি পারদ।
- **ডায়াস্টোলিক চাপ (Diastolic pressure):** হৃৎপিণ্ডের নিলয় প্রসারিত থাকা অবস্থায় প্রবহমান রক্ত ধমনির প্রাচীরে যে নিম্নমাত্রার চাপ প্রয়োগ করে তাকে ডায়াস্টোলিক চাপ বলে। প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মানুষের এ রক্তচাপ 60-90 মি.মি পারদ।
- **উচ্চ রক্তচাপ (Hypertension):** নির্দিষ্ট বয়সে মানুষের সুস্থ শরীরে যে রক্তচাপ থাকা দরকার তার চেয়ে বেশি পরিমাপের রক্তচাপ সর্বদা বিদ্যমান থাকলে তাকে উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন বলে। সিস্টোলিক ও ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ যথাক্রমে 140 ও 90 মিলিমিটার/পারদ-এর বেশি হলে তাকে উচ্চ রক্তচাপ হিসেবে গণ্য করা হয়।

ব্যারোরিসেপ্টর (Baroreceptors)

ব্যারোরিসেপ্টর হলো রক্তনালিকার প্রাচীরে বিদ্যমান বিশেষ সংবেদী স্নায়ুপ্রান্ত (sensory nerve endings) যেগুলো রক্তচাপ পরিবর্তনে বিশেষভাবে সাড়া দেয়। এগুলো মস্তিষ্কের ভেগাস স্নায়ু থেকে সৃষ্টি হয় এবং দেহে রক্তচাপের হোমিওস্টেসিস বা সাম্যবস্থা বজায় রাখে। রক্তনালিতে কোনো কারণে অস্বাভাবিক রক্তচাপ পরিলক্ষিত হলে এ উদ্দীপনা খুব দ্রুত ব্যারোরিসেপ্টর দ্বারা গৃহীত হয়ে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে প্রেরিত হয়। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র রক্তনালি ও হৃৎপিণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে। এ পদ্ধতিকে ব্যারোরিফ্লেক্স (baroreflex) বলা হয়।

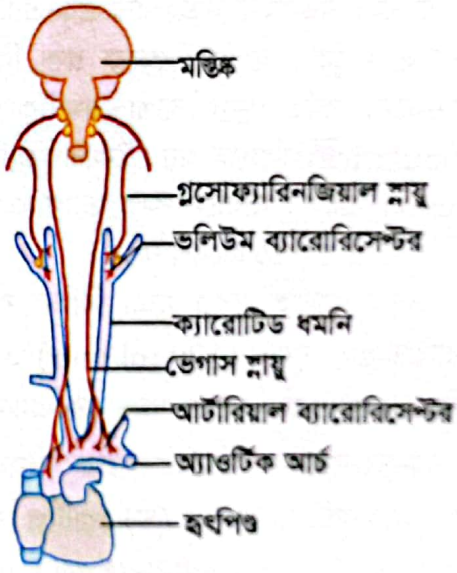

চিত্র ৪.২৪ ব্যারোরিসেপ্টর

ব্যারোরিসেপ্টর দুধরনের হয়, যথা উচ্চচাপ ব্যারোরিসেপ্টর (high pressure baroreceptor) বা আর্টারিয়াল ব্যারোরিসেপ্টর (arterial baroreceptor) এবং নিম্নচাপ ব্যারোরিসেপ্টর (low pressure baroreceptor) বা কার্ডিওপালমোনারি ব্যারোরিসেপ্টর (cardiopulmonary baroreceptor) বা ভলিউম ব্যারোরিসেপ্টর (volume baroreceptor)।

আর্টারিয়াল ব্যারোরিসেপ্টরগুলো অ্যাওর্টিক আর্চ এবং ক্যারোটিড সাইনাস নামক প্রধান ধমনিতে অবস্থান করে। এসব রক্তনালিতে সর্বদা উচ্চচাপে রক্ত প্রবাহিত হয়। ধমনির রক্তচাপ স্বাভাবিকের চেয়ে বৃদ্ধি পেলে এগুলো খুব দ্রুত সাড়া দেয়।

রক্তচাপের অস্বাভাবিক বৃদ্ধিতে এদের সংকেত প্রদানের মাত্রা বেড়ে গিয়ে হৃৎস্পন্দন ও রক্তনালির ক্রিয়া কমে যায়। একসময় এদের সংকেত প্রদান বন্ধ হয়ে গেলে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র হৃৎস্পন্দন ও রক্তনালির ক্রিয়া বাড়িয়ে দেয় এবং রক্তচাপ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনে। ব্যারোরিসেপ্টরগুলো খুব অল্প সময়ের জন্য রক্তচাপ বৃদ্ধিতে সাড়া দেয়। দীর্ঘ সময় ব্যাপী রক্তচাপ উচ্চ মাত্রায় থাকলে এরা এটাকে স্বাভাবিক হিসেবে মানিয়ে নেয়। এর ফলে স্থায়ী উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন সৃষ্টি হয়।

CamScanner

ভলিউম ব্যারোরিসেপ্টরগুলো প্রধান সিস্টেমিক শিরা, পালমোনারি শিরা এবং হৃৎপিণ্ডের ডান অলিন্দ ও নিলয়ের প্রাচীরে অবস্থান করে। এরা রক্তের আয়তন নিয়ন্ত্রণ করে বলে এদেরকে ভলিউম ব্যারোরিসেপ্টর বলে। রক্তের আয়তন রক্তনালির বিশেষ করে শিরার গড় চাপ নির্ণয় করে। ভলিউম ব্যারোরিসেপ্টর রক্ত সংবহন ও রেচন উভয়ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। এরা বৃক্কের হরমোন উৎপাদনে পরিবর্তন এনে রক্তের পানি ও লবণ ধরে রাখায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। রক্তের লবণ ও পানির মাত্রা রক্তচাপের উপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলে।

দেহের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ব্যারোরিসেপ্টর নিম্নলিখিত উপায়ে কাজ করে

রক্তচাপ বৃদ্ধি পেলে এরা মস্তিষ্কে অসংখ্য স্নায়ু উদ্দীপনা প্রেরণ করে। এসব উদ্দীপনা মস্তিষ্কের ভেসোমোটর কেন্দ্রের কাজের গতি হ্রাস করে। ফলে এ কেন্দ্র থেকে হৃৎপিণ্ড ও রক্তনালিকায় প্রেরিত উদ্দীপনার হারও কমে যায়। ভেসোমোটর কেন্দ্রের উদ্দীপনা প্রেরণ কমে যাওয়ায় হৃৎপিণ্ডের রক্তপ্রেরণ ক্রিয়া এবং প্রান্তীয় রক্তনালির প্রসারণ ক্রিয়া স্তিমিত হয়ে যায় এবং অনেক সময় হার্ট অ্যাটাকের মতো ঘটনা ঘটে। ব্যারোরিসেপ্টরের স্নায়ু উদ্দীপনা প্রেরণ কমে গেলে মস্তিষ্কের ভেসোমোটর কেন্দ্রের কাজের গতি পুনরায় ফিরে আসে এবং ফলে এ কেন্দ্র থেকে হৃৎপিণ্ড ও রক্তনালিকায় প্রেরিত উদ্দীপনার হারও বেড়ে যায়। ভেসোমোটর কেন্দ্রের উদ্দীপনা প্রেরণ বেড়ে গেলে হৃৎপিণ্ডের রক্তপ্রেরণ ক্রিয়া এবং প্রান্তীয় রক্তনালির প্রসারণ ক্রিয়া পুনঃস্থাপিত হয়ে রক্তচাপ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

৪.৭ মানবদেহে রক্তসংবহন পদ্ধতি (Blood Circulation in Human Body)

মানবদেহের রক্তসংবহনতন্ত্র বদ্ধ প্রকৃতির অর্থাৎ রক্তনালিকার প্রান্তভাগ মুক্ত নয় এবং রক্ত হৃৎপিণ্ড ও রক্তবাহিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত বিভিন্ন ধমনির মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে পৌঁছায়। অঙ্গের বিভিন্ন কলায় ধমনিগুলো অতি ক্ষুদ্র শাখা ধমনিকায় (arterioles) বিভক্ত হয় যেগুলো পুনরায় অসংখ্য কৈশিকজালিকায় (capillaries) বিভক্ত হয়। কৈশিকজালিকা কলার ভেতরে ক্ষুদ্র শিরা (venules) গঠন করে যেগুলো বৃহৎ শিরা (veins) গঠনের মাধ্যমে কলা ত্যাগ করে। দেহের বিভিন্ন অঙ্গ হতে আগত শিরাগুলো মহাশিরায় (venae cavae) মিলিত হয়ে হৃৎপিণ্ড প্রবেশ করে।

দেহে রক্ত প্রবাহের মাত্রা বিভিন্ন কলায় ভিন্নরকম হয়। যকৃতে সবচেয়ে বেশি মাত্রায় (1350ml/min) রক্ত প্রবাহিত হয়। বৃক্ক (1100 ml/min) ও মস্তিষ্কে (700ml/min) যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাত্রায় রক্ত প্রবাহিত হয়। প্রতি 60 সেকেন্ডে দেহের সমস্ত রক্ত একবার সমগ্র মানবদেহে পরিভ্রমণ করে।

মানবদেহে চার পদ্ধতিতে রক্ত সংবহন সংঘটিত হয়, যথা–(ক) সিস্টেমিক সংবহন; (খ) পালমোনারি সংবহন; (গ) করোনারি সংবহন ও (ঘ) পোর্টাল সংবহন।

(ক) সিস্টেমিক সংবহন (Systemic circulation): যে পদ্ধতিতে হৃৎপিণ্ড থেকে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত সমগ্র দেহে প্রেরিত হয় এবং দেহ হতে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে তাকে সিস্টেমিক সংবহন বলে। এ রক্ত সংবহন সারা দেহের জন্য অক্সিজেন, খাদ্যসার ও বর্জ্য পদার্থ বহন করে। এক্ষেত্রে একটি মহাধমনির (aorta) বা সিস্টেমিক ধমনির মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের বাম নিলয় থেকে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত রক্ত বের হয়ে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অংশে প্রেরিত হয় এবং বিভিন্ন শিরার মাধ্যমে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত সংগৃহীত হয়ে দুটি মহাশিরার (venacava) মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের ডান অলিন্দ হয়ে ডান নিলয়ে ফিরে আসে। সিস্টেমিক সংবহনের গতিপথ হলো:

বাম নিলয় → মহাধমনি → অঙ্গ-তন্ত্র → মহাশিরা → ডান অলিন্দ → ডান নিলয়

(খ) পালমোনারি সংবহন (Pulmonary circulation): যে পদ্ধতিতে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ড হতে ফুসফুসে প্রেরিত হয় এবং ফুসফুস হতে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে তাকে পালমোনারি সংবহন বলে। এক্ষেত্রে

CamScanner

হৃৎপিণ্ডের ডান নিলয় থেকে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত পালমোনারি ধমনি দ্বারা ফুসফুসে নীত হয় এবং ফুসফুস থেকে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত পালমোনারি শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের বাম অলিন্দে ফিরে আসে। পালমোনারি সংবহনের গতিপথ হলো:

ডান নিলয় → পালমোনারি ধমনি → ফুসফুস → পালমোনারি শিরা → বাম অলিন্দ → বাম নিলয়

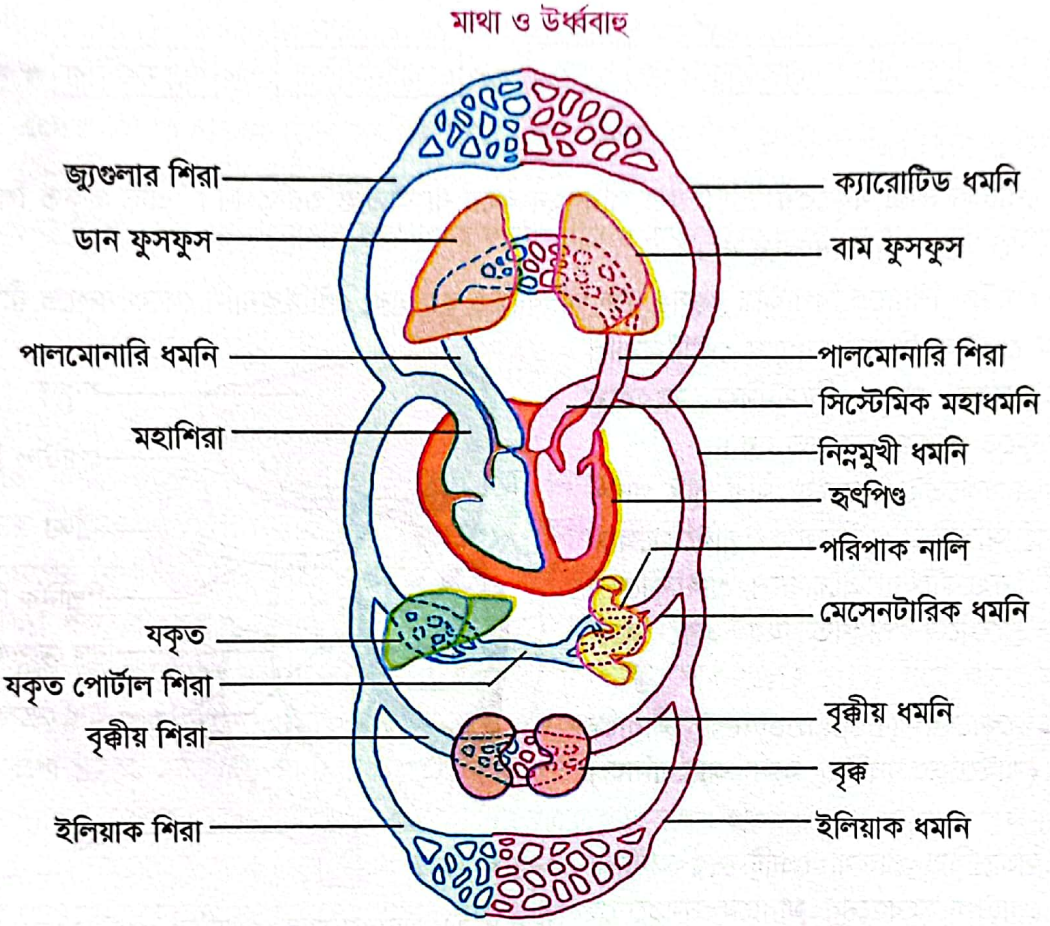

চিত্র ৪.২৫ মানবদেহের রক্ত সংবহন

(গ) করোনারি সংবহন (Coronary circulation): হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের সকল অঙ্গে রক্ত সংবাহিত হয়। কিন্তু হৃৎপিণ্ড নিজেই দেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। দেহে অবিরাম রক্তপ্রবাহ বহাল রাখার জন্য হৃৎপিণ্ডের নিজেরও প্রচুর শক্তির প্রয়োজন হয়। আর রক্ত থেকেই এ শক্তি সংগৃহীত হয়। যে পদ্ধতিতে হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরে রক্ত সংবাহিত হয় তাকে করোনারি সংবহন বলে। হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরে সরাসরি হৃৎগহ্বর থেকে রক্ত সঞ্চারিত হয় না। সিস্টেমিক ধমনির গোড়া হতে সৃষ্ট করোনারি ধমনির মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত সংবাহিত হয়। হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর হতে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত করোনারি শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের ডান অলিন্দে প্রবেশ করে।

সিস্টেমিক ধমনি → করোনারি ধমনি → হৃৎপ্রাচীর → করোনারি শিরা → ডান অলিন্দ

(ঘ) পোর্টাল সংবহন (Portal circulation): কোনো কোনো অঙ্গে কৈশিকজালিকা থেকে উৎপন্ন শিরা হৃৎপিণ্ডের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে অন্য একটি মাধ্যমিক অঙ্গে প্রবেশ করে এবং সেখানে পুনরায় কৈশিকজালিকায় বিভক্ত হয়। এ ধরনের রক্ত সংবহনকে পোর্টাল সংবহন বলে। মেরুদণ্ডী প্রাণীতে যকৃত ও বৃক্কীয়-এ দুধরনের পোর্টাল সংবহন দেখা যায়। মানবদেহে কেবল যকৃত পোর্টালতন্ত্র (hepatic portal system) বিদ্যমান। এক্ষেত্রে পাকস্থলি, অগ্ন্যাশয়, অন্ত্র

CamScanner

এবং প্লীহা থেকে জালিকার মাধ্যমে সংগৃহীত রক্ত হেপাটিক পোর্টাল শিরার মাধ্যমে যকৃতের দিকে প্রবাহিত হয়। যকৃতে পৌঁছে হেপাটিক পোর্টাল শিরা পুনরায় জালিকার মতো সাইনুসয়েডে বিভক্ত হয়। এসব সাইনুসয়েড পরে একীভূত হয়ে হেপাটিক শিরা গঠন করে এবং এর মাধ্যমে রক্ত নিম্ন মহাশিরা বা ইনফেরিয়র ভেনাক্যাভায় পরিবাহিত হয়। সেখান থেকে রক্ত হৃৎপিণ্ডে পৌঁছে। মানুষসহ সকল স্তন্যপায়ী প্রাণীতে কোনো বৃক্কীয় পোর্টালতন্ত্র (renal portal system) থাকে না।

পৌষ্টিক অঙ্গাদি → হেপাটিক পোর্টাল শিরা → যকৃত → হেপাটিক শিরা → নিম্ন মহাশিরা → হৃৎপিণ্ড

যকৃত বা হেপাটিক পোর্টাল সংবহনের গুরুত্ব

১। হেপাটিক পোর্টাল শিরা যকৃতের 75% রক্ত পরিবহন করে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি প্রকৃত শিরা নয় কেননা এটি সরাসরি হৃৎপিণ্ডে রক্ত পরিবহন করে না।

২। হেপাটিক পোর্টাল শিরাতে বিপাকীয় বস্তুসহ রক্ত পরিবাহিত হয় এবং পৌষ্টিকনালি থেকে যকৃতে নীত হয়।

৩। হেপাটিক পোর্টাল শিরার মাধ্যমে পৌষ্টিকনালি থেকে শোষিত সরল খাদ্য সিস্টেমিক সংবহনে প্রবেশের পূর্বে যকৃতে প্রক্রিয়াজাতকৃত হয়।

৪। অন্ত্রের পরে যকৃতেই সবচেয়ে বেশি পুষ্টি পদার্থ শোষিত হয় এবং অতিরিক্ত গ্লুকোজকে গ্লাইকোজেনে পরিণত করে। দেহকোষের প্রয়োজনে গ্লাইকোজেন ভেঙ্গে পুনরায় গ্লুকোজে পরিণত হয় এবং রক্তে প্রবাহিত হয়।

৫। যকৃত কোষের (hepatocytes) মাধ্যমে বিষাক্ত পদার্থ (নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য অ্যামোনিয়া) অপসারিত হয়।

৬। যকৃতে সংশ্লেষিত প্লাজমা প্রোটিনসহ অন্যান্য বস্তু হেপাটিক পোর্টাল সংবহনের মাধ্যমে সমগ্রদেহে প্রেরিত হয়।

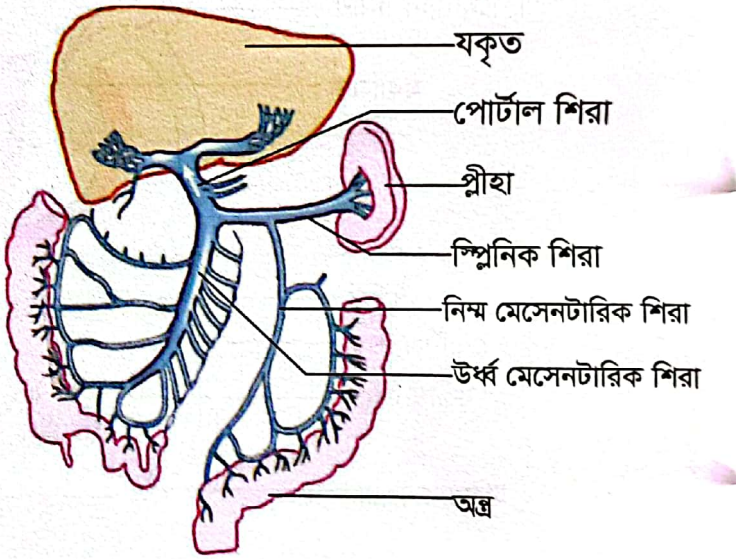

চিত্র ৪.২৬ মানবদেহের হেপাটিক পোর্টাল তন্ত্র

সিস্টেমিক সংবহন ও পালমোনারি সংবহন-এর মধ্যে পার্থক্য

সিস্টেমিক সংবহন	পালমোনারি সংবহন
১। এক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ড এবং দেহের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে (ফুসফুস ব্যতিত) রক্ত সংবাহিত হয়।	১। এক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ড এবং ফুসফুসের মধ্যে রক্ত সংবাহিত হয়।
২। সিস্টেমিক সংবহন হৃৎপিণ্ডের বাম পার্শ্বে সংঘটিত হয়।	২। পালমোনারি সংবহন হৃৎপিণ্ডের ডান পার্শ্বে সংঘটিত হয়।
৩। সিস্টেমিক সংবহনে ধমনি O_2 সমৃদ্ধ রক্ত এবং শিরা CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত পরিবহন করে।	৩। পালমোনারি সংবহনে ধমনি CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত এবং শিরা O_2 সমৃদ্ধ রক্ত পরিবহন করে।
৪। এটি হৃৎপিণ্ডের বাম নিলয়ে শুরু হয় এবং ডান অলিন্দে শেষ হয়।	৪। এটি হৃৎপিণ্ডের ডান নিলয়ে শুরু হয় এবং বাম অলিন্দে শেষ হয়।
৫। এ সংবহনের মাধ্যমে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে।	৫। এ সংবহনের মাধ্যমে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে।

CamScanner

মানুষসহ সকল স্তন্যপায়ী প্রাণীতে কোনো বৃক্কীয় পোর্টালতন্ত্র থাকে না কেন?

বৃক্কীয় পোর্টালতন্ত্র বা রেনাল পোর্টাল সিস্টেম হলো রক্ত সংবহনের দ্বিতীয় একটি পথ যেখানে দেহের পশ্চা] অংশের রক্ত হৃৎপিণ্ডে প্রবেশের পূর্বে রেনাল পোর্টাল শিরার মাধ্যমে বৃক্কে প্রবেশ করে। বৃক্কে রক্তের পরিশোধন ঘটে। স্তন্যপায়ী প্রাণী ব্যতিত অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীতে (মাছ, উভচর, সরীসৃপ ও পাখি) গ্লোমেরুলার ছাঁকন যন্ত্র (glomerular filtration) না থাকায় রক্ত রেনাল পোর্টাল শিরার মাধ্যমে সরাসরি রেনাল নালিতে প্রবেশ করে। স্তন্যপায়দের বৃক্কে গ্লোমেরুলার ছাঁকন যন্ত্র বিদ্যমান এবং এখানে অক্সিজেনরিক্ত এবং অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত পৃথকভাবে প্রবাহিত হয়। এদের দেহের পশ্চাৎ অংশ হৃৎপিণ্ড হতে সিস্টেমিক ধমনীর মাধ্যমে অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত গ্রহণ করে এবং কোষীয় বিপাকের পর ফিরতি রক্তে তেমন কোনো নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য থাকে না। ফলে এ রক্ত পরিশোধনের জন্য বৃক্কে প্রেরণের প্রয়োজন না থাকায় স্তন্যপায়ীদের রক্তসংবহনতন্ত্রে কোনো বৃক্কীয় পোর্টালতন্ত্র থাকে না।

৪.৮ হৃৎরোগের বিভিন্ন অবস্থায় করণীয়

হৃৎরোগ কী? (What is heart disease?)

মানব হৃৎপিণ্ড এবং রক্তনালির কতিপয় সমস্যা বা রোগকে সমষ্টিগতভাবে **হৃৎরোগ** বা **হার্ট ডিজিস** বা **কার্ডিওভাসকুলার ডিজিস** (Cardiovascular disease) বলে। বর্তমানে উন্নত বিশ্বে এক নম্বর মরণ ব্যাধি হলো হৃৎরোগ। হৃৎরোগের বিশাল ছাতার নিচে অন্তর্ভুক্ত হলো হৃৎপিণ্ডের রোগ (হৃৎপিণ্ডে সরবরাহকারী ধমনি, হৃৎপেশি ও কপাটিকার বিভিন্ন ধরনের রোগ), রক্তনালির রোগ (যেসব ধমনি ও শিরা হৃৎপিণ্ড হতে ও হৃৎপিণ্ডে রক্ত বহন করে তাদের রোগ) এবং জন্মগতভাবে হৃৎপিণ্ডের ত্রুটি। বর্তমান পৃথিবীতে মোট মৃত্যুর 30% হয়ে থাকে হৃৎরোগ জনিত কারণে, এজন্য একে **বিশ্বের এক নম্বর ঘাতক ব্যাধি** বলা হয়ে থাকে। বিশ্বে প্রতিবছর 1কোটি 73 লক্ষ মানুষ এ রোগে মারা যায় যার মধ্যে 82% এর মৃত্যু হয় নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলোতে। এ মৃত্যু খুবই হতাশাজনক। কারণ হৃৎরোগ এবং স্ট্রোকসহ বিভিন্ন ক্রনিক রোগে যারা মারা যায় তাদের অর্ধেকেরই বয়স হয় জীবনের সবচেয়ে সুন্দরতম সময় এবং কর্মজীবনের 15-30 বছরের মধ্যে। কিছু নিয়ম যেমন-স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া, কায়িক পরিশ্রম করা এবং তামাকমুক্ত জীবন-যাপনের মাধ্যমে এ অকাল মৃত্যু অনেকাংশে এড়ানো সম্ভবপর হয়। অলস ও নিষ্ক্রিয় ব্যক্তিরা নিয়মিত ব্যায়ামকারী ও কায়িক পরিশ্রমি ব্যক্তি থেকে হৃৎরোগের দ্বিগুণ ঝুঁকিতে থাকে।

হৃৎরোগ প্রতিরোধের উপায়: হৃৎরোগ প্রতিরোধের জন্য কিছু বিষয় মেনে চলতে হবে। যেমন-

(i) ধূমপান বন্ধ করতে হবে; (ii) ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে; (iii) রক্তের কোলেস্টেরল মাত্রা সর্বদা সঠিক রাখতে হবে; (iv) চর্বি জাতীয় খাবার পরিত্যাগ করে নিম্ন ক্যালরিযুক্ত খাবার খেতে হবে; (v) নিয়মিত হালকা ব্যায়াম করতে হবে, (vii) দেহের স্থূলতা দূর করতে হবে, (viii) অ্যালকোহল বা মদ্যপান বর্জন করতে হবে, (ix) খাবারের সাথে অতিরিক্ত লবণ খাওয়া কমাতে হবে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের যে শাখায় মানব হৃৎপিণ্ডের রোগ, রোগ নির্ণয় ও প্রতিরোধের উপায় নিয়ে অধ্যয়ন করা হয় তাকে হৃৎবিজ্ঞান বা কার্ডিওলজি (Cardiology; Gr. *kardia*=heart+*logia*=study) **বলে। হৃৎপিণ্ড ও রক্তনালি সম্পর্কিত বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও দক্ষ চিকিৎসককে কার্ডিওলজিস্ট** (Cardiologist) **বলে।**

নিম্নে কয়েকটি হৃৎরোগ সম্পর্কে ধারণা দেয়া হলো:

১। অ্যানজাইনা বা বুকে ব্যথা (Angina/Chest pain)

হৃৎপিণ্ড থেকে সমগ্র দেহের বিভিন্ন অঙ্গে রক্ত সরবরাহ হয়। হৃৎপিণ্ড নিজেই একটি অঙ্গ হওয়ায় এরও রক্ত সরবরাহের প্রয়োজন হয়। যে রক্ত নালি দ্বারা হৃৎপিণ্ড নিজে রক্ত সরবরাহ পেয়ে থাকে তাকে করোনারি ধমনি (coronary artery) বলে। করোনারি ধমনি সংক্রান্ত একটি অতি পরিচিত উপসর্গ হলো অ্যানজাইনা। একে অনেকসময়

CamScanner

অ্যানজাইনা পেকটোরিস (angina pectoris) বলা হয়। এর ফলে বুকে ব্যথা, বুক ভারী লাগা, বুকের চারদিকে চাপ, জ্বালাপোড়া, অস্বস্তি লাগা প্রভৃতি উপসর্গ অনুভূত হয়। অনেকসময় একে বদহজমজনিত ব্যথা বলে ভ্রান্ত ধারণা করা হয়।

অ্যানজাইনার প্রকার: সাধারণত তিন ধরনের অ্যানজাইনা হয়ে থাকে, যথা-

(ক) সুস্থিত অ্যানজাইনা (Stable angina): এক্ষেত্রে বুকের ব্যথা অনুভূত হয় কেবল পরিশ্রম কিংবা চরম আবেগীয় বিষন্নতার কারণে। বিশ্রাম নিলে এ ব্যথা চলে যায়।

(খ) অস্থিত অ্যানজাইনা (Unstable angina): বিশ্রামের সময় বুকের ব্যথা অনুভূত হলে তাকে অস্থিত অ্যানজাইনা বলা হয়। এ ব্যথা প্রায়শই হয়ে থাকে এবং অনেক সময়ব্যাপি প্রচণ্ড ব্যথা অনুভূত হয়। এ ধরনের অ্যানজাইনা হার্ট অ্যাটাকের পূর্ব লক্ষণ।

(গ) প্রিনজমেটাল অ্যানজাইনা (Prinzmetal angina): বিশ্রামের সময় কিংবা ঘুমের সময় কিংবা ঠাণ্ডার কারণে এ ধরনের অ্যানজাইনা দেখা দেয়।

অ্যানজাইনা কারণ

- করোনারি ধমনি দ্বারা হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরের পেশিতে রক্ত সরবরাহ কমে গেলে পেশির কোষগুলো অক্সিজেন ও শর্করা (গ্লুকোজ) স্বল্পতায় পড়ে এবং শক্তি উৎপাদন বাধাগ্রস্থ হয়। কিন্তু দেহে অবিরাম রক্ত সরবরাহের জন্য হৃৎপেশিগুলোকে সর্বদা কার্যক্ষম থাকতে হয়। পরিমিত অক্সিজেনের অভাবে হৃৎপেশির কোষগুলো অবাত শ্বসন প্রক্রিয়ায় বিকল্প উৎস পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে শক্তি উৎপাদন করে। এসময় উপজাত হিসেবে ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি হয়। অধিক পরিমাণ ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি হলে তা পেশিতে জমা হয়, ফলে ব্যথা অনুভূত হয়।
- করোনারি ধমনির সমস্যা ছাড়াও অ্যানজাইনা হতে পারে। অ্যানজাইনা আক্রান্ত মাত্র 30% মানুষের হৃৎপিণ্ডের কপাটিকা (valve) সমস্যার কারণে করোনারি আর্টারিতে রক্ত প্রবাহ বিঘ্নিত হয়।
- অ্যানিমিয়া আক্রান্ত রোগীরও অ্যানজাইনা দেখা দেয় কেননা তাদের রক্তে পরিমিত অক্সিজেন থাকে না।
- যেসব মানুষের হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর অতিমাত্রায় পুরু থাকে তাদেরও অ্যানজাইনা দেখা দেয়, কারণ তাদের হৃৎপ্রাচীর চাহিদার তুলনায় কম পরিমাণ অক্সিজেন পেয়ে থাকে।

বুকে ব্যথা বুঝার উপায়: সাধারণত যে কোনো ধরনের পরিশ্রম করলে বা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলে বা ব্যায়াম করলে বুকে ব্যথা অনুভূত হয়। এসব কাজ থেকে বিরত থাকলে বা পরিশ্রম কমিয়ে দিলে ব্যথা আস্তে আস্তে কমে যায়। এ থেকে হার্টের ব্যথা নিশ্চিতভাবে বোঝা যায়। এ ব্যথা বুকের বাম বা ডান যে কোনো পাশে হতে পারে। এ ব্যথা সাধারণত বুকে অনুভূত হলেও অনেকসময় এটি কাঁধ, বাহু, ধড়, চোয়াল বা পিঠে ছড়িয়ে পড়ে।

কারা বুকের ব্যথায় আক্রান্ত হতে পারে: যাদের বয়স 40 এর উপরে, যারা ধুমপায়ী (ধুমপান রক্তনালির প্রাচীর পুরু করে রক্তনালির লুমেন সরু করে দেয়, ফলে রক্ত সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটে), যাদের অনিয়ন্ত্রিত বা বেশি মাত্রায় ডায়াবেটিস আছে, যাদের উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন আছে, যাদের রক্তে উচ্চ মাত্রার কোলেস্টেরল আছে এবং যারা কোনো কায়িক পরিশ্রম করে না তারা বুকের ব্যথায় বা অ্যানজাইনায় আক্রান্ত হতে পারে।

প্রতিকার: রোগ দেখা দেয়ার সাথে সাথে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরীক্ষা ও ওষুধ সেবন করতে হবে। এছাড়া রোগের অবস্থা অনুযায়ী চিকিৎসক অপারেশন অথবা এনজিওগ্রাম-এর পরামর্শ দিতে পারেন।

২। হার্ট অ্যটাক (Heart attack)

প্রকৃতপক্ষে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় হার্ট অ্যাটাক বলতে কিছু নেই। সাধারণ মানুষের কাছে যা হার্ট অ্যাটাক নামে পরিচিত তা আসলে **মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন** বা এম আই (myocardial infarction)। দীর্ঘ সময়ব্যাপি হৃৎপিণ্ডের কোনো অংশে রক্ত সরবরাহ বন্ধ থাকলে ঐ অংশের পেশিগুলো অকার্যকর হয়ে কিংবা মরে গিয়ে যে সমস্যা সৃষ্টি করে তাকেই সাধারণ ভাষায় **হার্ট অ্যাটাক** (heart attack) বলে।

CamScanner

হার্ট অ্যাটাকের কারণ

❑ হার্ট অ্যাটাকের প্রধান পাঁচটি কারণ হলো ধুমপান, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, রক্তে চর্বির আধিক্য ও পজেটিভ ফেমিলি হিস্ট্রি।

❑ অধিকাংশ হার্ট অ্যাটাক ঘটে হৃৎপিণ্ডের করোনারি আর্টারিতে রক্ত চলাচল বিঘ্নতার কারণে। এক্ষেত্রে রক্তের কোলেস্টেরল প্রধানত দায়ী। রক্তে অধিক পরিমাণ কোলেস্টেরল থাকলে এগুলো করোনারি আর্টারির প্রাচীরে জমে শক্ত প্ল্যাক (plaque) গঠন করে। এ প্ল্যাকের সাথে রক্ত কণিকাগুলো যুক্ত হয়ে রক্ত জমাট বাঁধে। একে অ্যাথারোস্ক্লেরোসিস (atherosclerosis) বলে। করোনারি আর্টারি হৃৎপ্রাচীরে রক্ত সরবরাহ করে। রক্ত জমাট বাঁধার কারণে এর মধ্য দিয়ে রক্ত প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়, ফলে হৃৎপেশির কোষগুলো অক্সিজেনের অভাবে মরে যায় এবং হার্ট অ্যাটাক ঘটে।

❑ কোনো কারণে শারীরিক ক্রিয়া বেড়ে গেলে হার্ট অ্যাটাক ঘটতে পারে অথবা প্রচণ্ড মানসিক চাপ বা বিষন্নতা কিংবা অসুস্থতার কারণে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে।

❑ রক্তের অণুচক্রিকার কার্যকারিতা বেড়ে গেলে, রক্তের ফাইব্রিনোজেন ও ফ্যাক্টর VIII বেড়ে গেলে হার্ট অ্যাটাক হয়ে থাকে। হার্ট অ্যাটাক কখন ঘটবে তা কেউ জানে না। এটি যে কোনো সময় ঘটতে পারে। এটি বিশ্রাম বা ঘুমের সময়ও ঘটতে পারে।

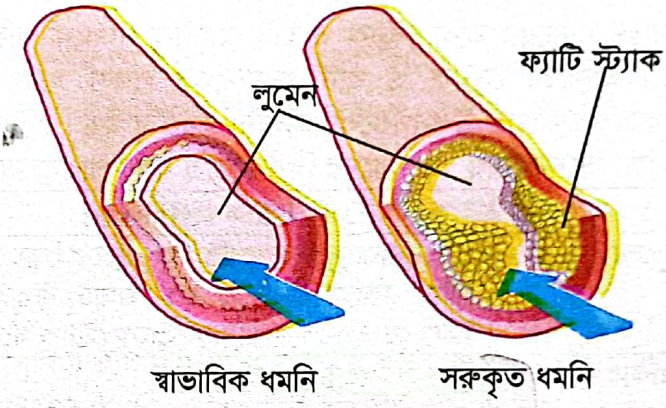

চিত্র ৪.২৭ প্ল্যাক গঠন

হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ

- হার্ট অ্যাটাকের প্রাথমিক লক্ষণ হলো বুকের ব্যথা। এ ব্যথা সাধারণত বুকে অনুভূত হলেও অনেকসময় এটি কাঁধ, বাহু, ধড়, চোয়াল বা পিঠে ছড়িয়ে পড়ে। তবে সব সময় বুকে ব্যথা নাও হতে পারে।
- পুরুষের হার্ট অ্যাটাকের ব্যথা অনেকসময় বাম বাহুতে এবং নারীদের দু বাহুতে হতে পারে।
- অবিরাম কাশি বা বুকে শো শো শব্দ হার্ট অ্যাটাকের উপসর্গ হতে পারে।
- হার্ট অ্যাটাক হলে মাথা ঝিম ঝিম করা বা চেতনা লোপ পাওয়ার মতো ঘটনা ঘটতে পারে। বিশেষ করে নারীদের মধ্যে অস্বাভাবিক ক্লান্তি ঘটতে পারে। এটি কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহ থাকতে পারে।
- বমিভাব বা বমি হতে পারে, এছাড়া ক্ষুধামন্দা দেখা দিতে পারে। দ্রুত বা অনিয়মিত নাড়ি স্পন্দন এবং সে সাথে দুর্বলতা ও শ্বাসকষ্ট হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ হতে পারে।
- হার্ট অ্যাটাকে একটি সাধারণ উপসর্গ হলো শীতল ঘাম হওয়া। হঠাৎ করে শীতল ঘাম শরীর বেয়ে অবিরাম ঝড়তে থাকে যেমনটি কঠোর ব্যায়ামের পর হয়ে থাকে।
- হার্ট অ্যাটাকের কিছুদিনের মধ্যে পায়ে, গোড়ালিতে, পায়ের পাতা বা উদরে পানি জমা হতে পারে।
- হার্ট অ্যাটাকের সময় কিংবা অ্যাটাকের কয়েক দিন পূর্ব হতে শরীর অস্বভাবিকভাবে দুর্বল অনুভূত হবে।
- 75% ডায়াবেটিস রোগীর হার্ট অ্যাটাকের সময় বুকে ব্যথা হয়।
- শেষ রাতে ও সকাল 9 টার পূর্ব পর্যন্ত হার্ট অ্যাটাকের হার সবচেয়ে বেশি। তাই শেষ রাতে বা ভোরের বুকের ব্যথাকে অবহেলা করা ঠিক নয়।

হার্ট অ্যাটাকের প্রতিকার

হার্ট অ্যাটাক চিকিৎসার প্রধান পছন্দ হলো অ্যানজিওপ্লাস্টি। রক্তনালিকার ভেতরের রক্ত জমাট ভাঙ্গতে রোগীকে ওষুধ সেবন করার পরামর্শ দেয়া হয়। বুকে ব্যথা অনুভূত হওয়ার 3 ঘণ্টার মধ্যে এ ধরনের ওষুধ সেবন করতে হয়। এ চিকিৎসাকে থ্রম্বোলাইটিক থেরাপি (thrombolytic therapy) বলে। অনেকক্ষেত্রে রোগীর বাইপাস ওপেন হার্ট সার্জারির প্রয়োজন হয়।

CamScanner

হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধ

নিয়মিত ওষুধ সেবন ও জীবন-যাপন পদ্ধতির পরিবর্তন করে হার্ট অ্যাটাক রোধ করা যায়। জীবন-যাপন পদ্ধতির পরিবর্তনের বিশেষ দিক হলো:

- হৃৎবান্ধব স্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণ করা
- রক্তের কোলেস্টেরল মাত্রা ঠিক রাখা
- নিয়মিত ব্যায়াম করা
- ধূমপান পরিত্যাগ করা
- ডায়বেটিকস ও উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা
- মানসিক চাপ ও বিষন্নতা পরিহার করা
- স্থূলতা নিয়ন্ত্রণ করা
- অ্যালকোহল ও মদ্যপান থেকে বিরত থাকা
- প্রফুল্ল-আনন্দময় জীবন যপন করা
- চর্বিযুক্ত খাবার পরিহার করা

স্ট্রোক ও হার্ট অ্যাটাক এর মধ্যে পার্থক্য

সাধারণ মানুষের মধ্যে স্ট্রোক ও হার্ট অ্যাটাক সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নেই। অধিকাংশক্ষেত্রে দুটোকে এক করে দেখা হয়। মানুষের স্ট্রোক ও হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ হঠাৎ ঘটে। যদিও দুটি ঘটনার কিছু সাধারণ উপসর্গ থাকে অধিকাংশক্ষেত্রেই উপসর্গগুলো আলাদা ধরনের হয়। স্ট্রোক ও হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণগুলো পৃথকভাবে চিহ্নিত করতে পারলে অনেকসময় বড় ধরনের বিপদ হতে রক্ষা পাওয়া যায়।

	স্ট্রোক (Stroke)	হার্ট অ্যাটাক (Heart attack)
সংজ্ঞা	মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহকারি ধমনি ছিড়ে গিয়ে রক্তক্ষরণ ঘটলে কিংবা ধমনিতে রক্ত জমাট বাঁধার কারণে হঠাৎ যে উপসর্গ দেখা যায় তাকে স্ট্রোক বলে।	হৃৎপিণ্ডের রক্ত সরবরাহকারি করোনারি ধমনিতে প্ল্যাগ সৃষ্টি কিংবা রক্ত জমাট বাঁধার কারণে হঠাৎ যে উপসর্গ দেখা যায় তাকে হার্ট অ্যাটাক বলে।
প্রকার	তিন প্রকারের হয়, যথা- ■ ট্রান্সসিয়েন্ট ইশকেমিক অ্যাটাক (TIA) ■ ইশকেমিক স্ট্রোক ■ হেমোরেজিক স্ট্রোক	তিন প্রকারের হয়, যথা- ■ STEMI হার্ট অ্যাটাক ■ NSTEMI হার্ট অ্যাটাক ■ নিরব হার্ট অ্যাটাক
লক্ষণসমূহ	অপ্রত্যাশিত মাথা ঘোরা বা ভারসাম্য হারানো; দেহের একপাশের দূর্বলতা বা অসাড়তা (প্যারালাইজড); প্রচণ্ড মাথাব্যথা; এক বা উভয় চোখের অস্বাভাবিক অস্পষ্টতা; কথা বলতে বা বোঝার ক্ষেত্রে সমস্য ইত্যাদি।	বুক ব্যথা বা ভার হয়ে যাওয়া; বাহু বা কাঁধে অব্যক্ত ব্যথা, পিঠে, ঘাড়ে বা চোয়ালে অব্যক্ত ব্যথা; ছোট নিঃশ্বাস; দূর্বলতা, মাথা ঘোরা, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।
রোগ নির্ণয়	মাথার CT বা MRI, রক্ত প্রোটিন পরীক্ষা, ইকোকার্ডিওগ্রাফি, ইলেকটোকার্ডিওগ্রাম, সেরিব্রাল এনজিওগ্রাফি, ক্যারেটিড আল্ট্রাসাউন্ড ইত্যাদি পরীক্ষা।	ইলেকটোকার্ডিওগ্রাম, রক্ত প্রোটিন পরীক্ষা, ইকোকার্ডিওগ্রাফি, করোনারি ক্যাথারাইজেশন (অ্যানজিওগ্রাম), কার্ডিয়াক CT বা MRI ইত্যাদি পরীক্ষা।
চিকিৎসা	ডাক্তারের পরামর্শে দ্রুত টিস্যু প্লাজমিনোজেন অ্যাকটিভেটর (tPA) বা অ্যাল্টিপ্লেজ IV r-tPA জাতীয় ওষুধ সেবন, সার্জারি, ফিজিওথেরাপি ইত্যাদি।	ডাক্তারের পরামর্শে দ্রুত অ্যাসপিরিন, নাইট্রোগ্লিসারিন, ইনহিবিটর ACE জাতীয় ওষুধ সেবন, কার্ডিয়াক ক্যাথেরাইজেশন, লেন অ্যানজিওপ্লাস্টি, স্ট্যান্ট স্থাপন ইত্যাদি।

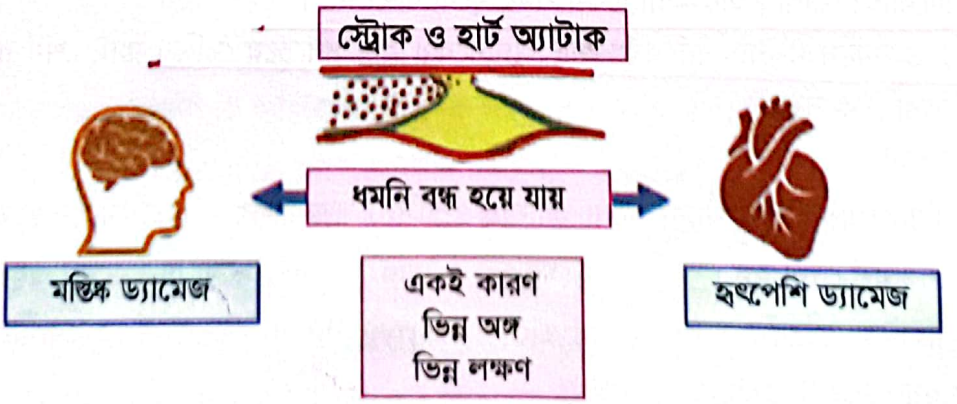

CamScanner

৩। হার্ট ফেইলিউর (Heart failure)

হৃৎপিণ্ড যখন দক্ষতার সাথে দেহে রক্ত সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয় তখন তাকে হার্ট ফেইলিউর (heart failure) বলে। এটি ধীরে ধীরে প্রকট অবস্থা লাভ করে। হার্ট ফেইলিউর হৃৎপিণ্ডের বাম পাশে অথবা ডান পাশে ঘটতে পারে।

হার্ট ফেইলিউরের কারণ: বিভিন্ন কারণে হার্ট ফেইলিউর ঘটতে পারে। যেমন- (i) স্থূলতা ও উচ্চ রক্তচাপ; (ii) অতিরিক্ত ধুমপান ও মদ্যপান; (iii) হৃৎপিণ্ডের কপাটিকার রোগ; (iv) ইশকেমিক হার্ট ডিজিস; (v) কার্ডিও মায়োপ্যাথি বা ক্রনিক হার্ট মাসল ডিজিস; (vi) হৃৎপিণ্ডের ছন্দোপতন; (vii) হৃৎপিণ্ডে বংশগত রোগ; (viii) অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির অস্বাভাবিকতা; (ix) অতিমাত্রার রক্তশূণ্যতা ইত্যাদি।

হার্ট ফেইলিউরের লক্ষণ: হার্ট ফেইলিউর হৃৎপিণ্ডের বাম পাশে হলে একরকম এবং ডান পাশে হলে অন্যরকম লক্ষণ প্রকাশ পায়।

হার্ট ফেইলিউর বাম পাশে হলে- ১। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি ও সময় কমে যায়; ২। কোনো কায়িক পরিশ্রমে শ্বাস কষ্ট হয়; ৩। শুষ্ক কফের সৃষ্টি হয় যা বের করা যায় না; ৪। ক্লান্তি ও অবসাদগ্রস্থ অনুভব করা; ৫। পেশির দুর্বলতা; ৬। দেহের ওজন কমে যায়।

হার্ট ফেইলিউর ডান পাশে হলে-১। পা ফুলে যাওয়া (ওডেমা); ২। পায়ের নিচের অংশের ত্বক শুষ্ক হয়ে যায়; ৩। পায়ে একজিমার মতো লাল দাগ পড়ে যা পরে জটিল ঘা এ পরিণত হয়; ৪। উদর গহ্বর এবং তদস্থিত অঙ্গগুলোতে তরল পদার্থ জমে বিশেষ করে ফুসফুস ও যকৃতে তরল জমে ফুলে যায়।

প্রতিকার: হার্ট ফেইলিউর চিকিৎসারক্ষেত্রে চিকিৎসকগণ ব্যবস্থাপত্রে অ্যাসপাইরিন, ডাইগোজিন, নাইট্রোগ্লিসারিন ও অন্যান্য নাইট্রেট, বিটা ব্লকারস, ACE ইনহেবিটর, ডাইইউরেটস, ওয়ারফারিন ইত্যাদি ওষুধ দিয়ে থাকেন। প্রয়োজনে চিকিৎসকগণ বাইপাস সার্জারি কিংবা ভাল্ব প্রতিস্থাপনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

৪.৯ হৃৎরোগের চিকিৎসায় ধারণা

হৃৎরোগ রোগ নির্ণয়

- ❑ চিকিৎসকগণ হার্ট বিটের হার বৃদ্ধি, হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক শব্দ, পা ফুলে যাওয়া, ঘাড়ের শিরা ফুলে যাওয়া, যকৃত বড় হওয়া ইত্যাদি লক্ষণগুলো দেখে হৃৎরোগ সহজেই নির্ণয় করতে পারেন।
- ❑ বুকের X-ray করানোর মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের অবস্থা জানা যায়।
- ❑ ইসিজি (Electrocardiogram)- হৃৎপিণ্ডের প্রাথমিকভাবে রোগ নির্ণয়ে ইসিজি সাহায্য করে।
- ❑ ইটিটি (Exercise Tolerance Test)-এর সাহায্যে হৃৎপিণ্ডের অবস্থা বা কার্যক্ষমতা ভালোভাবে জানা যায়।
- ❑ রক্তের BNP (brain natriuretic peptide) পরীক্ষার মাধ্যমে হার্ট ফেইলিউর সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।
- ❑ করোনারি এনজিওগ্রাম-এর সাহায্যে হৃৎপিণ্ডের রক্তনালিতে কোনো ব্লক আছে কিনা তা দেখা হয়।
- ❑ হৃৎপিণ্ডের পেশির অবস্থা জানার জন্য MRI (magnetic resonance imaging) পরীক্ষা করা।
- ❑ উচ্চ রক্তচাপ আছে কিনা তা পরীক্ষা করা।
- ❑ রক্তে শর্করা ও চর্বির পরিমাণ নির্ণয়ের পরীক্ষা করা।

১। পেস মেকার কার্যক্রম

মানুষসহ সকল স্তন্যপায়ী প্রাণীর হৃৎপিণ্ড উন্নত ধরনের। এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সঙ্কোচিত-প্রসারিত হয়ে সমগ্র দেহে রক্ত পরিচালনা করে। মানবদেহে প্রতি মিনিটে গড়ে 75 বার হৃৎচক্র বা হার্টবিট সম্পন্ন হয়। এতে প্রচণ্ড গতিতে (ধমনিতে 40 cm/s, শিরায় 15 cm/s) দেহে রক্ত প্রবাহিত হয়। হৃৎপিণ্ডের ডান অলিন্দে বিদ্যমান Sino-Atrial Node বা SAN নামক বিশেষ ধরনের কলা থেকে বৈদ্যুতিক সংকেত বা ইলেকট্রিকেল সিগন্যাল সৃষ্টি হয়ে সমগ্র হৃৎপিণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে। এতে হৃৎচক্র সম্পন্ন হয়। Sino-Atrial Node বা SAN কে পেসমেকার (pacemaker) নামে আখ্যায়িত করা হয়।

CamScanner

হৃৎপিণ্ডের অলিন্দে বিদ্যমান এ পেসমেকার বিরামহীনভাবে বৈদ্যুতিক সংকেত সৃষ্টি করে হৃৎপিণ্ডকে সচল রাখে। হৃৎপিণ্ড সক্রিয় রাখতে প্রতি মিনিটে 1-5 ওয়াট বিদ্যুৎ সমপরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয়। কোনো কারণে এ পেসমেকার কাজ না করলে ত্রুটিযুক্ত বৈদ্যুতিক সংকেত সৃষ্টি হয় এবং হার্টবিটের ছন্দোপতন ঘটে। একে অ্যারিদমিয়াস (arrhythmias) বলে। এসময় হার্টবিট খুব দ্রুত গতিতে (tachycardia) বা খুব মন্থর (bradycardia) গতিতে সংঘটিত হয়। ফলে হৃৎপিণ্ড পর্যাপ্ত রক্ত দেহে সরবরাহ করতে পারে না। এরকম ঘটনায় আমরা ক্লান্তি ও শ্বাসকষ্ট অনুভব করি। তীব্র অ্যারিদমিয়াস দেহের অত্যাবশ্যক অঙ্গের কলা ধ্বংস করে এবং অনেকসময় মানুষ অজ্ঞান হয়ে যায় এমনকি মৃত্যুবরণ করে।

দেহের Sino-Atrial Node বা পেসমেকার কাজ না করলে হৃৎপিণ্ডের সাথে **কৃত্রিম পেসমেকার স্থাপন** করে অ্যারিদমিয়াস নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে হার্টবিট স্বাভাবিক করা যায়। **কৃত্রিম পেসমেকার হলো একটি বিশেষ ধরনের যন্ত্র যার মাধ্যমে মানুষের অনিয়ন্ত্রিত হৃৎস্পন্দন বা হার্টবিট নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।** এ যন্ত্র হতে নিম্ন মাত্রার বৈদ্যুতিক সংকেত সৃষ্টি হয়ে হৃৎস্পন্দন এর সূচনা করে। এটি স্থাপিত হলে যাদের হৃৎস্পন্দনের সমস্যা আছে তারা স্বাভাবিক জীবন যাত্রা করতে পারে। দুইজন আমেরিকান বিজ্ঞানী **উইলিয়াম কার্ডেক** (William Chardack) এবং **উইলসন গ্রেটব্যাচ** (Wilson Greatbatch) 1969 সালে দেহে স্থাপনযোগ্য পেসমেকার আবিষ্কার করেন।

পেসমেকার যা করে: এটি মন্থর হৃৎস্পন্দনকে গতিশীল করে এবং দ্রুতশীল হৃৎস্পন্দনকে স্বাভাবিক করে। এটি হৃৎপিণ্ডের উপরের ও নিচের প্রকোষ্ঠের মধ্যে বৈদ্যুতিক সংকেতের সমন্বয় ঘটায়। এটি অলিন্দদ্বয়ের মধ্যে বৈদ্যুতিক সংকেতের সমন্বয় ঘটায়। এটি বিপদজনক হার্টবিট long QT syndrome (LQTS) নিয়ন্ত্রণ করে। আধুনিক পেসমেকার রক্তের তাপমাত্রা, শ্বাস হার এবং হৃৎস্পন্দন পর্যবেক্ষণ করতে পারে। এছাড়া এটি মানুষের বিভিন্ন কর্মতৎপরতার সাথে হৃৎস্পন্দনের সমন্বয় করতে পারে। পেসমেকার স্থায়ী কিংবা অস্থায়ী হতে পারে। স্বল্প মেয়াদী হৃৎযন্ত্রের সমস্যা যেমন, হার্ট এটাক ঘটাতে পারে এমন ধীর হৃৎস্পন্দন কিংবা হার্ট সার্জারির সময় জরুরী ভিত্তিতে অস্থায়ী পেস মেকার ব্যবহার করা হয়। দীর্ঘমেয়াদি হৃৎযন্ত্রের অ্যারিদমিয়াস সমস্যার ক্ষেত্রে স্থায়ী পেসমেকার ব্যবহৃত হয়। তবে বর্তমানে এধরনের সমস্যার ক্ষেত্রে আরো আধুনিক যন্ত্র আইসিডি (ICD =implantable cardioverter defibrillator) ব্যবহার করা হয়।

পেসমেকার যেভাবে কাজ করে: একটি পেসমেকার প্রধান দুটি অংশ নিয়ে গঠিত-একটি **জেনারেটর** (generator) এবং একটি **লিড** (lid) বা তার। জেনারেটরটি প্রকৃতপক্ষে ব্যাটারি নিয়ন্ত্রিত একটি ক্ষুদ্র কম্পিউটার যেটি টিটিনিয়াম নির্মিত একটি বাক্সে আবদ্ধ থাকে। তারটি নমণীয় প্রতিরোধক আবরণযুক্ত যার এক প্রান্ত জেনারেটরের সাথে যুক্ত থাকে এবং অপর প্রান্তটি মুক্ত থাকে যা হৃৎপিণ্ডের সাথে যুক্ত করা হয়। তারের মুক্ত প্রান্তে সেনসর বা ক্যাথোড থাকে। হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে তার প্রবেশের সংখ্যানুযায়ী কৃত্রিম পেস মেকার নিম্নের তিন ধরনের হয়-

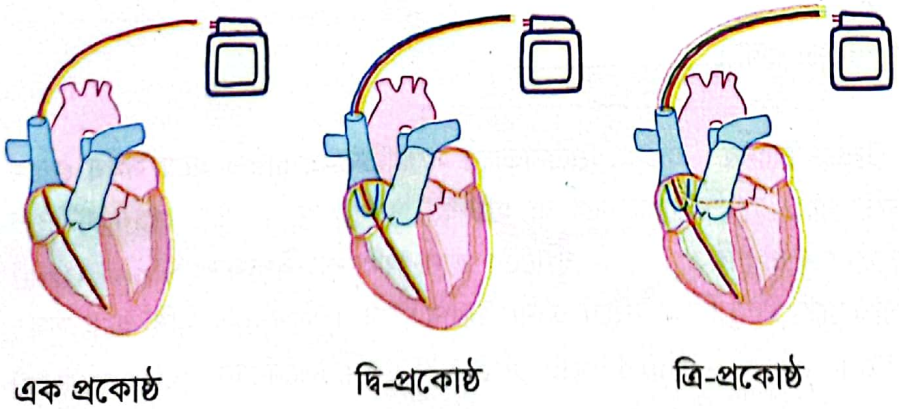

চিত্র ৪.২৮ বিভিন্ন ধরনের পেসমেকার

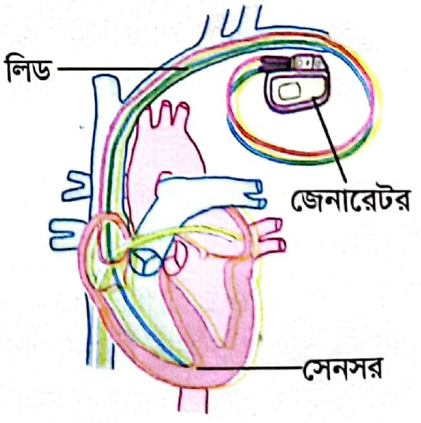

চিত্র ৪.২৯ পেসমেকার পরানো হৃৎপিণ্ড

CamScanner

১। এক প্রকোষ্ঠ পেসমেকার (Single-chamber pacemaker): এ ধরনের পেসমেকারে একটি তার বা লিড থাকে যা হৃৎপিণ্ডের ডান অলিন্দ অথবা ডান নিলয়ের সাথে যুক্ত করা হয়।

২। দ্বি-প্রকোষ্ঠ পেসমেকার (Dual-chamber pacemaker): এ ধরনের পেসমেকারে দুটি তার বা লিড থাকে যা হৃৎপিণ্ডের ডান অলিন্দ ও ডান নিলয়ের সাথে যুক্ত করা হয়।

৩। ত্রি-প্রকোষ্ঠ পেসমেকার (Triple-chamber pacemaker): এ ধরনের পেসমেকারে তিনটি তার বা লিড থাকে যার একটি হৃৎপিণ্ডের ডান অলিন্দে, একটি ডান নিলয়ে এবং অন্যটি বাম নিলয়ের সাথে যুক্ত করা হয়।

বর্তমানে ব্যবহৃত অধিকাংশ পেসমেকারের দুটি তার থাকে যাদের একটি ডান অলিন্দে এবং অপরটি ডান নিলয়ে যুক্ত করা হয়। স্থানীয় অ্যানেসথেসিয়ার (অবশ) মাধ্যমে দেহে পেসমেকার স্থাপন করা হয়। এটি স্থাপন করতে 30 মিনিট থেকে এক ঘণ্টা সময় লাগে। এর জেনারেটরটি কণ্ঠাস্থি (collar bone/clavicle) সংলগ্ন ত্বকের নিচে স্থাপন করা হয়। লিড বা তারের ক্যাথোড প্রান্তটি উপযুক্ত শিরার ভেতর দিয়ে হৃৎপিণ্ডের উপযুক্ত স্থানে সংযুক্ত করা হয়।

পেসমেকার হৃৎস্পন্দন পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করে। এর ইলেকট্রোডগুলো হৃৎপিণ্ডের বৈদ্যুতিক ক্রিয়াকলাপ শনাক্ত করে এবং তারের মাধ্যমে জেনারেটরে প্রেরণ করে। কোনো অস্বাভাবিক হৃৎস্পন্দন নির্ণীত হলেই জেনারেটর থেকে বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা তারের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে পৌছায় এবং হৃৎস্পন্দনকে স্বাভাবিক করে।

২। ওপেন হার্ট সার্জারি

হৃৎপিণ্ডের অনেক জটিল সমস্যা দূর করতে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়। সাধারণত চিকিৎসকগণ বৈদ্যুতিক করাত দিয়ে বুকের অস্থিকে চিরে হৃৎপিণ্ডকে উন্মুক্ত করেন। এধরনের অস্ত্রোপচারকে ওপেন হার্ট সার্জারি (open heart surgary) বলা হয়। টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উইলফ্রেড জি. বিগলো (Wilfred G. Bigelow) 1950 সালে সর্বপ্রথম ওপেন হার্ট সার্জারি প্রয়োগ করেন।

যেসব ক্ষেত্রে ওপেন হার্ট সার্জারি করা হয়-

১। করোনারি রক্তনালিতে ব্লক হলে দেহের অন্য কোনো রক্তনালি দিয়ে বন্ধ রক্তনালিতে রক্তপ্রবাহ স্বাভাবিক করা।
২। হৃৎপিণ্ডের কোনো কপাটিকার (valve) মেরামত বা প্রতিস্থাপন করা।
৩। হৃৎপ্রাচীরের কোনো নষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্থ অংশ মেরামত বা প্রতিস্থাপন করা।
৪। হৃৎপিণ্ডে কোনো যন্ত্র বসানো।
৫। হৃৎপিণ্ড পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেলে কোনো দাতার হৃৎপিণ্ড দ্বারা প্রতিস্থাপন করা।

যেভাবে ওপেন হার্ট সার্জারি করা হয়

ওপেন হার্ট সার্জারিতে একদল দক্ষ বিশেষজ্ঞ শল্যচিকিৎসকের (surgeon) প্রয়োজন হয়। ওপেন হার্ট সার্জারির শুরুতে রোগীকে সাধারণ অ্যানেস্থেসিয়ার (general anesthesia) মাধ্যমে অজ্ঞান করা হয়। এরপর বুকের স্টার্নাম বরাবর 8-10 ইঞ্চি কেটে ভেতরের হৃৎপিণ্ড উন্মুক্ত করা হয়। ওপেন হার্ট সার্জারি প্রধানত নিম্নলিখিত তিন উপায়ে করা হয়:

(১) অন-পাম্প সার্জারি (On-pump surgery): একে কার্ডিওপালমোনারি বাইপাস (Cardiopulmonary bypass) বলা হয়। এক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ডকে পুরোপুরি থামিয়ে দিয়ে সার্জারি করা। এসময় একটি হার্ট-লাং মেশিনের (Heart-Lung machine) সাহায্যে দেহের রক্ত সঞ্চালন অব্যাহত রাখা হয়। এটি একটি প্রচলিত ধরনের ওপেন হার্ট সার্জারি।

(২) অফ-পাম্প বা বিটিং হার্ট সার্জারি (Off-pump or beating heart surgery): এক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ডকে সচল রেখে সার্জারি করা হয়। এসময় কোন হার্ট-লাং মেশিনের সাহায্যে নেয়া হয় না।

(৩) মিনিমালি ইনভেসিভ বা রোবট সহযোগী সার্জারি (Minimally invasive or Robot-assisted surgary): এক্ষেত্রে বুকের খুব অল্প অংশ কাটা হয় এবং শল্যচিকিৎসক বিশেষ কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত রোবটিক হাতের সাহায্যে অস্ত্রোপচার করেন। এটি একটি আধুনিক ও নিখুত ওপেন হার্ট সার্জারি।

CamScanner

সতর্কতা

ওপের হার্ট সার্জারির রোগীদের কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। যেমন-ওপেন হার্ট সার্জারির পর রোগীকে হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (intensive care unit-ICU) নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখতে হয়। ওপের হার্ট সার্জারির পর ধূমপান সম্পূর্ণরূপে পরিহার করতে হবে। চর্বিমুক্ত খাবার খেতে হবে। রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। নিয়মিত নিয়মমাফিক হাঁটাচলা করতে হবে। কোনোরকম শারীরিক অসুবিধা মনে হলে সাথে সাথে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে এবং ওষুধ সেবন করতে হবে।

বাংলাদেশে ওপের হার্ট সার্জারির অবস্থা

ওপেন হার্ট চিকিৎসার ব্যাপারে অনেকে খুব ভয় পায়। ওপেন হার্ট সার্জারি একসময় অনেক ব্যয়বহুল ও দুর্লভ ছিল। এ ধরনের চিকিৎসার জন্য বিদেশ গমন ছাড়া রোগীদের কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু বাংলাদেশে এখন বাইরের তুলনায় অনেক কম খরচে সফলতার সঙ্গে আন্তর্জাতিক মানের সুচিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। এটি এখন অন্যান্য অনেক সাধারণ সার্জারির মতো চিকিৎসা হিসেবে গৃহীত হয়েছে। প্রতি মাসে বাংলাদেশে প্রায় 500 ওপেন হার্ট সার্জারি হচ্ছে। এতে মৃত্যু হারও এখন মাত্র 0.4%। এর প্রতি মানুষের ভয়ও অনেকটা কেটে গেছে। সকালে অপারেশন হলে রোগী বিকালে চা খেতে পারে। আর দেড় থেকে দুমাসের মধ্যে রোগী সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে।

৩। করোনারি বাইপাস

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় করোনারি বাইপাস (Coronary bypass) বলতে করোনারি আর্টারি বাইপাস গ্রাফট বা সিএবিজি (Coronary Artery Bypass Graft-CABG) সার্জারি বুঝায়। হার্টে ইশকেমিক হার্ট ডিজিস অর্থাৎ এর ধমনিতে ব্লক হলে তা যদি স্টেন্ট বা রিং পড়িয়ে বা এনজিওপ্লাস্টি করে ভালো করার সম্ভাবনা না থাকে তাহলে সিএবিজি বা করোনারি বাইপাস অপারেশন করাতে হয়। করোনারি বাইপাসের সময় রোগীর ওপেন হার্ট সার্জারির প্রয়োজন হয়। এসময় রোগীর বুকের হাড়টিকে ইলেকট্রিক করাত দিয়ে কাটা হয় এবং হার্টের ধমনির যেসব জায়গায় ব্লক আছে তার পরবর্তী স্থানে আরেকটি রক্তনালি (গ্রাফট) লাগিয়ে দেয়া হয়। ফলে ব্লকের সামনে ও পেছনের ধমনিতে স্বাভাবিক হারে রক্ত প্রবাহ চলমান থাকে। পায়ের বা হাতের মোটা শিরা দিয়ে এ নতুন রক্তনালি তৈরী করা হয়। এজন্য সিএবিজি অপারেশনের রোগীর পা এবং হাতে কাটা দাগ থেকে যায়।

যেভাবে করোনারি বাইপাস করা হয়

করোনারি বাইপাস হার্ট স্পন্দিত অবস্থায় বা বিটিং হার্টে (beating heart) করা যায়। একে অপক্যাব (opcab) সার্জারি বলে। তবে বর্তমানে হৃৎস্পন্দন বন্ধ করেই (arrested heart) অধিকাংশ সিএবিজি সার্জারি করা হয়। এক্ষেত্রে হার্টকে পুরোপুরি থামিয়ে দেয়া হয় এবং অপারেশনের সময় হার্ট-লাং মেশিন (heart-lung machine) হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের কাজ চালিয়ে নেয়। বুকের মাঝখানে কাটা ছাড়াও বামপাশে ছোট করে কেটে সিএবিজে অপারেশন করা যায়। একে বলা হয় মিডক্যাব (MIDCAB) সার্জারি। বর্তমানে রোবট (robot) দিয়েও সিএবিজি সার্জারি (robotic surgery) করা হচ্ছে।

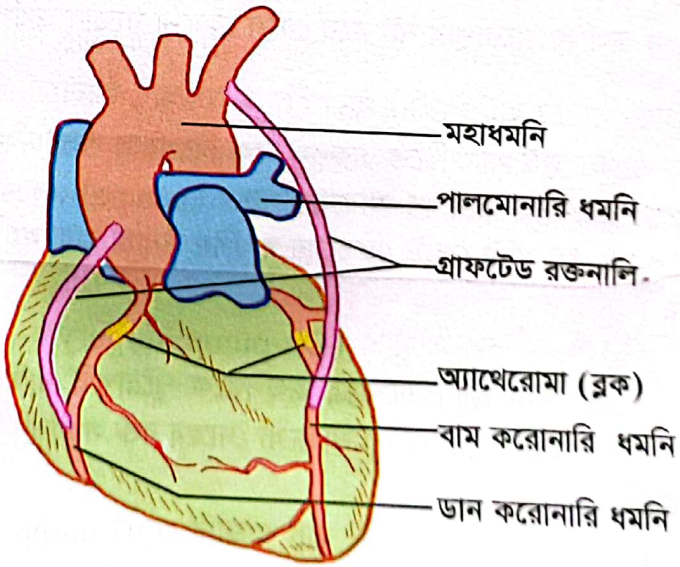

চিত্র ৪.৩০ করোনারি বাইপাস করা হৃৎপিণ্ড

এর ফলে হার্টের সার্জন একদেশে বসে অন্যদেশের রোগীর সিএবিজি সার্জারি করতে পারে।রোবটিক সার্জারিতে রোগীর গায়ে খুবই সামান্য একটি কাটা দাগ থাকে এবং খুব দ্রুত রোগী বাড়ি চলে যেতে পারে। করোনারি বাইপাস

CamScanner

সার্জারি এখন আর কোনো ভীতিকর সার্জারি নয়, এমনকি পুরোপুরি অজ্ঞান না করেও এ অপারেশন করা যায়। এর উত্তরোত্তর সাফল্যে মানুষের হৃৎরোগে মৃত্যুর হার অনেক কমে গেছে।

করোনরি বাইপাসের সফলতার হার

প্রায় 90% করোনারি বাইপাসের রোগী অপারেশনের পর তাৎপর্যপূর্ণ ভালো অবস্থা অনুভব করে। 70% রোগীর কোনো বুকের ব্যথা থাকে না এবং সম্পূর্ণ সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে, 20% রোগী আংশিকভাবে সুস্থ্যতা অনুভব করে এবং মাত্র 5-10% রোগীর একবছরের মধ্যে কিছু সমস্যা দেখা দেয়। কম বয়সী রোগী তুলনামূলক বেশি সুস্থতা ফিরে পায়। 70 বছর অধিক বয়সের রোগীদের কিছুটা সমস্যা থেকেই যায়। হৃৎরোগ প্রতিরোধের সাধারণ নিয়মগুলো যারা মেনে চলে না তারা করোনারি বাইপাসের দীর্ঘমেয়াদী সুফল পায় না। করোনারি বাইপাসের পর 90% রোগী কমপক্ষে 5 বছর, 80% রোগী 10 বছর, 55% রোগী 15 বছর এবং 40% রোগী 20 বছরের অধিককাল বেঁচে থাকে।

৪। অ্যানজিওপ্লাস্টি

অ্যানজিওপ্লাস্টি (angioplasty) বা করোনারি অ্যানজিওপ্লাস্টি (coronary angioplasty) হলো এক ধরনের চিকিৎসা যেখানে হৃৎপিণ্ডের করোনারি ধমনির সরু হয়ে যাওয়া অংশকে প্রশস্ত করা হয়। একে **পারকিউটেনাস করোনারি ইন্টারভেনশন** (percutaneous coronary intervention=PCI) বলা হয়। এক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ডের বড় ধরনের অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন পড়ে না, কেবল করোনারি ধমনির ভেতর একটি ক্যাথেটার (catheter) প্রবেশ করিয়ে ধমনিকে প্রশস্থ রাখার ব্যবস্থা করা হয়। ক্যাথেটার হলো একটি নমনীয়, লম্বা ও সরু টিউব বিশেষ যার দ্বারা করোনারি ধমনির সরু হয়ে যাওয়া অংশে একটি **করোনারি স্টেন্ট** (coronary stent) স্থাপন করা হয়। অ্যানজাইনা ও হার্ট অ্যাটাকের হৃৎরোগীদের করোনারি অ্যানজিওপ্লাস্টি করাতে হয়। অ্যানজিওপ্লাস্টির ফলে করোনারি ধমনি দিয়ে স্বাভাবিক রক্তপ্রবাহ ঘটে এবং হৃৎপিণ্ড সচল থাকে।

যে কারণে করোনারি ধমনি সরু হয়ে যায় তাকে অ্যাথারোমা (atheroma) বলে। করোনারি ধমনির প্রাচীরে একটু একটু করে দীর্ঘদিনব্যাপী কোলেস্টেরল জাতীয় চর্বি ক্রমে জমা হয়ে প্ল্যাক (plaques) গঠন করে। এ প্ল্যাক ক্রমে পুরু হয়ে অ্যাথারোমা গঠন করে যাকে সাধারণত করোনারির ব্লক বলা হয়। করোনারি আর্টারিতে একসাথে একাধিক অ্যাথারোমা গঠিত হতে পারে।

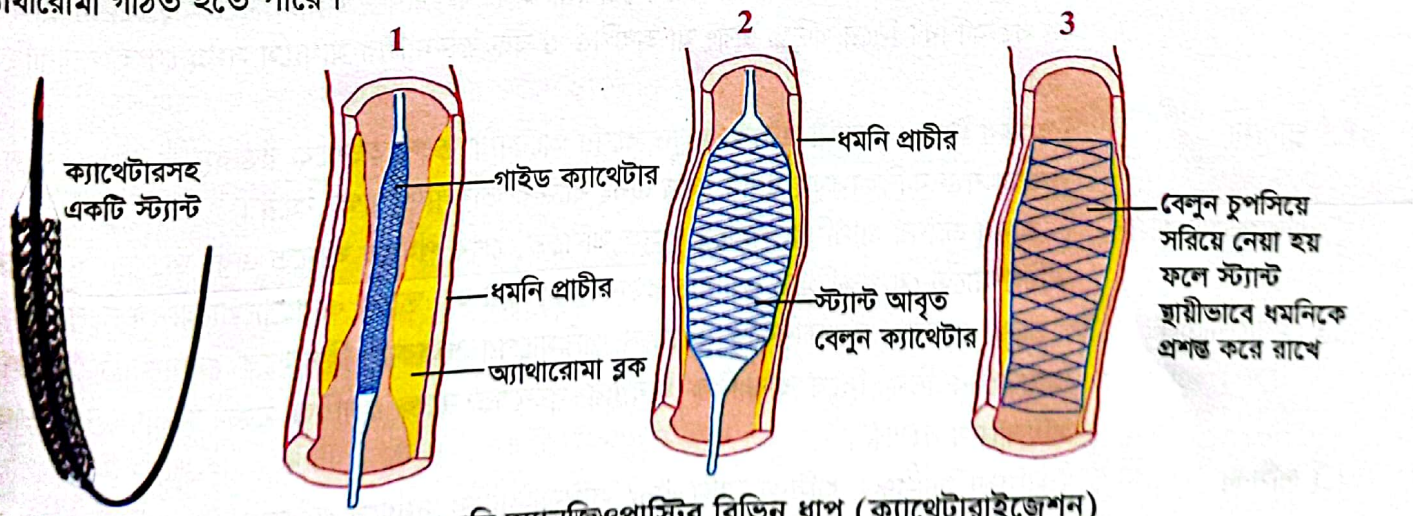

চিত্র ৪.৩১ করোনারি অ্যানজিওপ্লাস্টির বিভিন্ন ধাপ (ক্যাথেটারাইজেশন)

করোনারি অ্যানজিওপ্লাস্টি যেভাবে করা হয়

➢ কুঁচকির অথবা বাহুর (groin or arm) প্রধান রক্তনালিতে একটি মোটা সুঁইয়ের দ্বারা একটি গাইড ক্যাথেটার (guide catheter) প্রবেশ করানো হয়। এসময় যাতে ব্যথা না লাগে সেজন্য ত্বকে লোকাল অ্যানেসথেসিয়ার প্রয়োজন হয়।

➢ ডাক্তার ক্যাথেটারটিকে খুব ধীরে ধীরে ঠেলে হৃৎপিণ্ডের দিকে নিতে থাকে। একাজটি X-ray মেশিনের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করা হয়। রোগী নিজেও এটি পর্যবেক্ষণ করতে পারে।

➢ গাইড ক্যাথেটারের প্রান্তটি শেষ পর্যন্ত করোনারি ধমনির অ্যাথারোমা গঠিত সরু অংশে প্রবেশ করানো হয়। এরপর রক্তনালিতে গাইড ক্যাথেটারের মাধ্যমে একটি বেলুন ক্যাথেটার (balloon catheter) পাঠানো হয়। এর প্রান্তে থাকে একটি বেলুন ও একটি স্ট্যান্ট।

➢ করোনারি আর্টারির অ্যাথারোমা অংশে বেলুন ও স্ট্যান্ট প্রবেশ করানোর পর 30-60 সেকেণ্ডের মধ্যে বেলুনটিকে ফোলানো হয়। ফলে অ্যাথারোমার চর্বিগুলো চেপে গিয়ে সরু ধমনিকে প্রশস্ত করে। এসময় কিছুক্ষণের জন্য বুকে অ্যানজাইনার মতো তীব্র ব্যথা অনুভূত হতে পারে।

➢ সাধারণত বেলুন দ্বারা প্রশস্তকৃত অংশে স্ট্যান্টটি স্থাপন করা হয়। এটি ধাতুর তৈরি তারের জালিকাকার গঠন বিশিষ্ট কয়েক সেন্টিমিটার লম্বাকৃতির নল বিশেষ। এটি সুতার তৈরিও হতে পারে। স্ট্যান্টে কিছু ওষুধের প্রলেপ থাকে সেগুলো সর্বদা ধমনিতে মুক্ত হয়। এধরনের ওষুধ থাকার ফলে ধমনিতে পুনরায় ব্লক তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। করোনারি ধমনির এক বা একাধিক স্থানে একই প্রক্রিয়ায় স্ট্যান্ট স্থাপন করা হতে পারে।

একটি স্থানে অ্যানজিওপ্ল্যাস্টি করাতে 30-40 মিনিটের মতো সময় লাগে। একাধিক স্থানের অ্যানজিওপ্ল্যাস্টি করাতে আরো অধিক সময় লাগে। অ্যানজিওপ্ল্যাস্টি করানোর পর রোগীকে একদিন চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণে থাকতে হয়। অনেকসময় ধমনির সরু স্থান বেলুনের চাপে প্রসারিত হয় না। এক্ষেত্রে অ্যানজিওপ্ল্যাস্টি সম্ভব হয় না এবং চিকিৎসকগণ রোগীকে সিএবিজি সার্জারির পরামর্শ দেন।

অ্যানজিওপ্ল্যাস্টির ঝুঁকি: অধিকাংশক্ষেত্রে অ্যানজিওপ্ল্যাস্টির তেমন কোনো সমস্যা থাকে না। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এ চিকিৎসা পদ্ধতি ঝুঁকিপূর্ণ যেমন, এ প্রক্রিয়ার কারণে অনেকসময় করোনারি ধমনি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যেতে পারে, সেক্ষেত্রে দ্রুত সিএবিজি সার্জারির প্রয়োজন হয়। হার্ট অ্যাটাকের ঘটনাও ঘটতে পারে। ক্যাথেটার প্রবেশের সময় ধমনি ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কখনো কখনো স্ট্রোকের মতো ঘটনাও ঘটতে পারে। স্টেন্টের ভেতরে কয়েক মাস বা এক বছরের মধ্যে নতুন করে অ্যাথারোমা সৃষ্টি হতে পারে।

প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

- ❑ **রক্ত** : রক্ত বিশেষ ধরনের প্রবহমান তরল যোজক কলা যা অধিক আয়নিক ঘনত্বের দ্রবণ প্লাজমা ও রক্তকণিকা নিয়ে গঠিত এবং যা হৃৎপিণ্ড ও বদ্ধ রক্তনালির মাধ্যমে সমগ্র দেহে পরিবাহিত হয়।
- ❑ **প্লাজমা** : রক্তের ঈষৎ ক্ষারধর্মী হালকা হলুদ বর্ণের অকোষী তরল অংশকে রক্তরস বা প্লাজমা বলে। প্লাজমা রক্ত কণিকাসমূহ ধারণ করে এবং রক্তের তারল্যতা রক্ষা করে।
- ❑ **এরিথ্রোপোয়েসিস** : মানব ভ্রূণের প্রাথমিক পর্যায়ে কুসুম থলিতে, শেষ পর্যায়ে যকৃতে এবং জন্মের পর থেকে অস্থিমজ্জাতে যে পদ্ধতিতে লোহিত রক্তকণিকা সৃষ্টি হয় তাকে এরিথ্রোপোয়েসিস বলে।
- ❑ **হেমাটোক্রিট** : রক্তে লোহিত রক্তকণিকার আয়তন পরিমাপের শতকরা হিসাবকে হেমাটোক্রিট বলে। আয়তনের দিক দিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় পুরুষের রক্তে লোহিত রক্তকণিকা 45% এবং মহিলাদের 40%।
- ❑ **লসিকা** : লসিকা জালিকা, লসিকা-নালি এবং লসিকা-গণ্ডের সমন্বয়ে গঠিত লসিকাতন্ত্রের মধ্যে যে তরল দেখা যায় তার নাম লসিকা।
- ❑ **কাইল** : অধিক চর্বিযুক্ত খাবার খেলে লসিকাতে ফ্যাটের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং লসিকাকে দুধের মতো সাদা দেখায়। এ ধরনের লসিকাকে কাইল বলে।
- ❑ **ল্যাকটিয়েল** : অন্ত্রের প্রাচীরে সুবিকশিত লসিকানালিকে ল্যাকটিয়েল বলে।

CamScanner

❑ **রক্ততঞ্চন** : যে প্রক্রিয়ায় কেটে যাওয়া স্থানে বা ক্ষতস্থানের রক্ত জমাট বেঁধে দেহ হতে অবাঞ্ছিত রক্তপাত বন্ধ করে তাকে রক্ততঞ্চন প্রক্রিয়া বলে।

❑ **দ্বি-বর্তনী সংবহন** : যে রক্ত সংবহনে রক্ত সমগ্র দেহে একবার পরিপূর্ণ চক্র সম্পন্ন করার পূর্বে হৃৎপিণ্ড দিয়ে দুবার প্রবাহিত হয় তাকে দ্বি-বর্তনী সংবহন বলে। মানুষসহ সকল স্তন্যপায়ী ও পাখিদের দেহে এ ধরনের রক্ত সংবহন থাকে।

❑ **হৃৎস্পন্দন** : হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন-প্রসারণকে (শ্লথন) হৃৎস্পন্দন বলে। হৃৎপিণ্ডের প্রতিটি স্পন্দনে কতগুলো ধারাবাহিক ঘটনা সংঘটিত হয়।

❑ **মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ**: বাইরের কোনো উদ্দীপনা ছাড়াই হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। এ ধরনের নিয়ন্ত্রণকে মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ বলে।

❑ **উচ্চ রক্তচাপ** : নির্দিষ্ট বয়সে মানুষের সুস্থ শরীরে যে রক্তচাপ থাকা দরকার তার চেয়ে বেশি পরিমাপের রক্তচাপ সর্বদা বিদ্যমান থাকলে তাকে উচ্চরক্তচাপ বা হাইপারটেনশন বলে। সিস্টোলিক ও ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ যথাক্রমে 140 ও 90 মিলিমিটার/পারদ-এর বেশি হলে তাকে উচ্চ রক্তচাপ হিসেবে গণ্য করা হয়।

❑ **হার্ট ফেইলিউর** : হৃৎপিণ্ড যখন দক্ষতার সাথে দেহে রক্ত সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয় তখন তাকে হার্ট ফেইলিউর বলে।

❑ **অ্যানজিওপ্লাস্টি** : অ্যানজিওপ্লাস্টি বা করোনারি অ্যানজিওপ্লাস্টি হলো এক ধরনের চিকিৎসা যেখানে হৃৎপিণ্ডের করোনারি ধমনির সরু হয়ে যাওয়া অংশকে প্রশস্ত করা হয়। একে পারকিউটেনাস করোনারি ইন্টারভেনশন বলা হয়।

অনুশীলনী

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (নমুনা)

১. কোন রক্তকণিকা দেহে অ্যান্টিবডি তৈরি করে?
ক. নিউট্রোফিল খ. বেসোফিল গ. ইওসিনোফিল ঘ. লিম্ফোসাইট

২. রক্ততঞ্চনে নিচের কোন আয়ন অংশগ্রহণ করে?
ক. Ca^{++} খ. Mg^{++} গ. Cu^{++} ঘ. Fe^{++}

৩. মানবদেহের রক্ত সংবহনতন্ত্রের বর্ণনা করেন কোন বিজ্ঞানী?
ক. উইলয়াম হার্ভে খ. স্টিফেন হেলস গ. গ্যালেন ঘ. ক্রিস্টিয়ান বার্নাড

৪. মোট দৈহিক ওজনের কত শতাংশ রক্ত?
ক. 9-10% খ. 12-14% গ. 7-8% ঘ. 5-6%

৫. রক্তের pH মান কত?
ক. 5.35-5.45 খ. 7.35-7.45 গ. 6.35-6.45 ঘ. 8.35-8.45

৬. নিচের কোনটি প্লাজমা প্রোটিন নয়?
ক. অ্যালবুমিন খ. ফাইব্রিনোজেন গ. সাইটোক্রোম সি ঘ. ক্রিয়েটিন

৭. নিচের কোন প্রাণীর লোহিত রক্ত কণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে?
ক. বাদুর খ. শিম্পাঞ্জি গ. উট ঘ. বানর

৮. রক্তে লোহিত রক্তকণিকার আয়তন পরিমাপের শতকরা হিসাবকে কি বলে ?
ক. হেমাটোপয়সিস খ. হেমাটোক্রিট গ. এরিথ্রোপয়সিস ঘ. লিউকোপেমিয়া

৯. করোনারি ধমনি রক্ত সংবহন করে কোথায় ?
ক. যকৃতে খ. ফুসফুসে গ. বৃক্কে ঘ. হৃৎপিণ্ডে

১০. অলিন্দের ডায়াস্টোল কত সময়?